SUPERIOR SUNY

জানি না কখন

সুমন্ত আসলাম

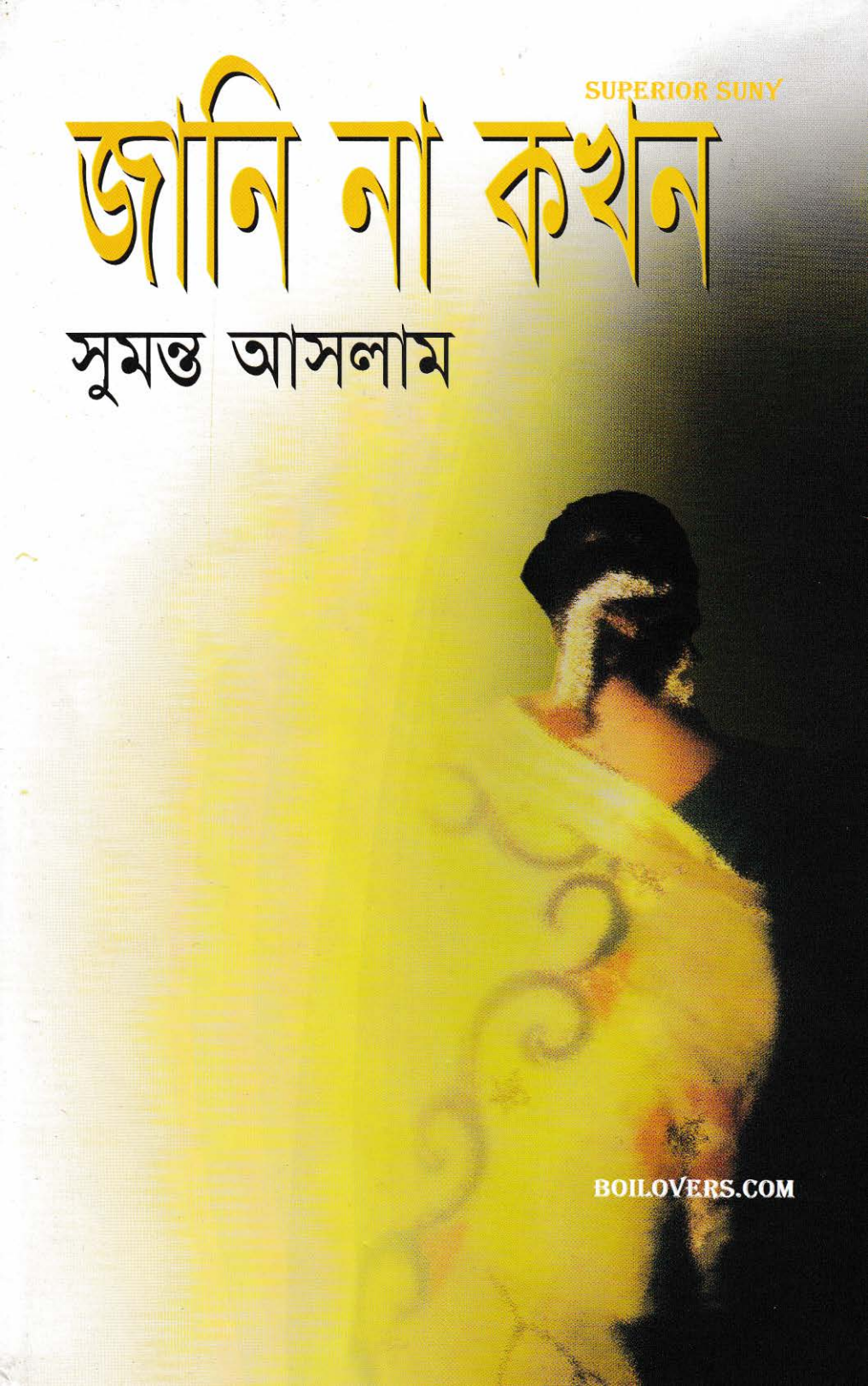

BOILOVERS.COM

শুভ্রার আজ বিশেষ একটা দিন, খুব বিশেষ একটা দিন। সে তাই সাজছে। নিজেকে যতটা সাজানো যায়, ঠিক ততটাই সাজছে। একা একা সাজার কারণটা হলো–।

না, আপাতত সেটা বলতে চাইছে না শুভ্রা। বলতে চাইছে না সে এটাও– কেন আজ তার একটা বিশেষ দিন।

শুভ্রা সাজছে, আর একটু পর পর ঘড়ি দেখছে।

ঢং ঢং।

হঠাৎ সাতটা বাজার সংকেত দেয় ঘড়িটা। ঠিক সে সময়টায় মা ঢোকেন শুভ্রার ঘরে। অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চান তিনি। কিন্তু তার আগেই হাত দিয়ে ইশারা করে মাকে থামিয়ে দেয় শুভ্রা। না, এ মুহূর্তে কোনো কিছু শুনতে চায় না সে। সে আজ সাজবে। অনেক যত্ন করে সাজবে, একা একা সাজবে।

কারণ– আজ তার বিশেষ একটা দিন, খুব বিশেষ একটা দিন।

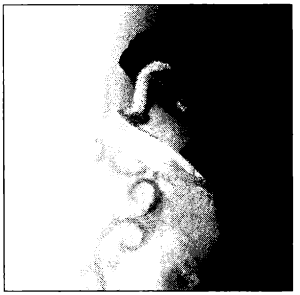

জানি না কখন

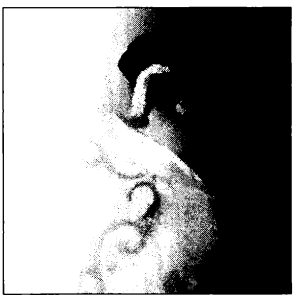

সুমন্ত আসলাম

লাইব্রেরি ★ স্থাপিত-১৯৭৮ অন্তর্ভুক্তি নং ৪৭৭৭৪৪ এভিনিউ, ঢাকা

সময়

জানি না কখন
সুমন্ত আসলাম
© লেখক

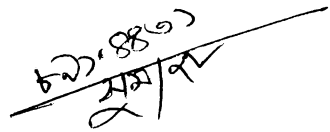

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৫

সময়

সময় ৫০৩

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
লেখক কর্তৃক কম্পোজকৃত

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার ঢাকা

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

JANI NA KOKHON (I don't know when it'll happen) A novel by Sumanto Aslam. First Published February Bookfair 2005 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Baglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : somoy.f@somoy.com

Price : Tk. 70.00 Only

ISBN 984-458-503-1 Code : 503

খুব প্রয়োজনে একজনের বাসায় গিয়েছিলাম একদিন। দু মিনিট পর তিনি এসে আন্তরিকভাবে বললেন, 'সুমন্ত, একটু বসো, মাগরিবের নামাজটা পড়ে আসি।'

অবাক চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি! যেখানে মানুষের মধ্যে থেকে ধর্ম-কর্ম কমে যাচ্ছে, এমন অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা ধর্ম বিশ্বাসই করেন না, সেখানে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপস্থাপক, পরিচালক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ধর্মে মনোনিবেশ করেন, ধর্মচর্চা করেন। মনটা নিমিষেই ভরে যায়, নিজের মাঝে জেগে যায় প্রগাঢ় এক ধর্মীয় বোধ, অনুভব করি গভীর এক প্রশান্তি।

প্রিয় হানিফ সংকেত, প্রিয় সংকেত ভাই
পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তির বিষয় হলো ধর্ম,
কোনো জিনিসই এর চেয়ে বেশি নয়।
খুব সত্য একটা কথা— আপনি কি বলেন?

‘সেইসব সময়েকে খুব ভালো লাগে
যখন তুই আর আমি
দুজনে মিলে লাখখানেক কিংবা লাখখানেকের সঙ্গে মিলে
তুই আর আমি
একজন।’

—পূর্ণেন্দু পত্রী

অ

অনেক অনেক দিনের পরে আজ

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠতেই মনে হলো—আজ আমি সাজব। যতটুকু সাজলে আর সাজা যায় না, ঠিক ততটুকু সাজব, খুব চমৎকারভাবে সাজব। কারণ আজ অন্যরকম একটা দিন।

সাজতে আমি কোনোদিনই পছন্দ করতাম না, এখনো করি না। ছোটকালে এই সাজতে না চাওয়ার কারণে আমাদের বাসার বুড়ো দারোয়ান দাদু প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন, 'না সাজলে তোমার কিন্তু বিয়ে হবে না, বুড়ি।' দারোয়ান দাদুর কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম, কোনো কথা বলতাম না তখন। চুপচাপ বসে থাকতাম ঘরের এক কোনায় আর মনে মনে ভাবতাম—মানুষ কেন সাজে, মানুষ তো এমনই সুন্দর! কখনো কখনো লুকিয়ে লুকিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে এও ভাবতাম—আমি কি সুন্দর? পরক্ষণেই ভাবতাম—হয়তো আমি সুন্দর, কিন্তু রূপবতী নই। রূপবতী হতে হলে তার সবকিছু সুন্দর হতে হয়। সবকিছু সুন্দর নয় আমার।

পার্থ বলে অন্য কথা। ও বলে, আমার সব সুন্দর, এমনকি আমার বাঁকা দাঁতগুলোও। খুব আদর করে একদিন আমার হাত ধরে ও বলেছিল, 'তূর্ণা, তোমার মুখটা হচ্ছে শান্ত নদী, আর বাঁকা দাঁতগুলো মৃদু মৃদু ঢেউ।'

কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা কেমন কেঁপে উঠেছিল পার্থর। আমি ওর চোখের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কথা বলতে কাঁপলে যে?'

'ভয় পেয়েছি।'

'কেন?'

'ভালোবাসলেই মানুষ ভয় পায়।'

বিস্মিত চোখে আমি ওর দিকে তাকালাম। মাথাটা নিচু করে ফেলে পার্থ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি অনুধাবন করলাম—আমিও ভয় পাই, আমিও পার্থকে ভয় পাই। অথচ ভালোবাসার আগে আমার জানাই ছিল না—ভালোবাসা আর ভয় একসঙ্গে হাঁটে, একসঙ্গে খেলা করে।

স্কুলে পড়ার সময় একবার এক পিকনিকে শাড়ি পরেছিলাম আমি। একা একাই। মা কী যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। তাই ঘরের দরজা বন্ধ করে, চুপি চুপি শাড়ি পরা শেষ করে যখন ঘর থেকে বের হলাম—মা আমাকে দেখে

হেসেই খুন। টানা কয়েক মিনিট মা হেসেছিল সেদিন। মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে হাসে আর আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে থাকি। শেষে খুব রেগে গিয়ে মাকে বলেছিলাম, 'এত হাসছো কেন?'

'তোকে দেখে।'

'আমাকে দেখে হাসির কী হলো?'

'তুই শাড়িটা অদ্ভুতভাবে পরেছিস।'

আমি আরো রেগে গিয়ে বললাম, 'কীভাবে পরেছি?'

মা আরো হাসতে হাসতে বলে, 'তুই নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

ভয় ভয় চোখে আমি নিজের দিকে তাকালাম। এবার হেসে ফেললাম আমিও। শাড়ি আমি পরেছিলাম ঠিকই, শুধু আঁচলটা কোমরে গুঁজেছিলাম, কোমরের অংশটা বানিয়েছিলাম আঁচল। আর নিচের দিকে ঠিক যতটুকু থাকা শোভনীয়, শাড়িটা তার চেয়েও উপরে ছিল প্রায় এক হাত। তারপর থেকে আমি আর শাড়ি পরিনি।

খুব করে পার্থ একদিন বলেছিল, 'একটা অনুরোধ করব?'

নির্ভার গলায় আমি বলেছিলাম, 'করো।'

'আগে বলো অনুরোধটা রাখবে।'

সবুজ ঘাসের নীল ফুল দেখছিলাম মাঠে বসে। মুখটা ঘুরিয়ে পাশে বসা পার্থর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'অনুরোধটা কী রাখার মতো?'

ও খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমিও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললাম, 'বলো।'

'তুমি একদিন শাড়ি পরে আসবে আমার সামনে?'

কী অদ্ভুত নরম গলায় বলল পার্থ! আমার এত মায়া হলো! পরের দিনই আমি শাড়ি পরে এসেছিলাম ভার্সিটিতে। পুরো তিন মিনিট ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'কী দেখছো ওভাবে?'

কিছুটা লজ্জা পেয়ে ও বলল, 'কিছু না।'

আমি হঠাৎ রেগে গিয়ে বললাম, 'কিছু না মানে!'

ও আবার বলল, 'কিছু না।'

আমি এবার দুঃখী দুঃখী গলায় বললাম, 'আমি কি তাহলে কিছু না?'

সঙ্গে সঙ্গে ও আমার একটা হাত টেনে নিয়ে ওর বুকে জড়াল। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করে শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'মানুষ প্রায় সব আবিষ্কার করে ফেলেছে, কেবল ভালোবাসার পরিমাপক আবিষ্কার করতে পারেনি এখনো।'

'ভালোবাসার তো পরিমাপক লাগে না, পার্থ। ভালোবাসা হচ্ছে অনুভবের ব্যাপার। একে অন্যকে ভালোবেসে মানুষ জেনে যায়—কে কতটুকু ভালোবাসে। যেমন আমি বুঝে গেছি, তুমি আমাকে কত ভালোবাসো।'

'আমিও।' ছোট্ট করে উত্তর দেয় পার্থ। তারপর আমার কাঁধে আলতো করে মাথাটা রেখে বলে, 'পৃথিবীটা সুন্দর, না?'

আমি ওর মাথার সঙ্গে আমার মাথা ঠেকিয়ে বলি, 'হ্যাঁ সুন্দর, খুব সুন্দর!'

আ

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঠিক মনে নেই। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। বেশ কয়েকবার রিং বাজে, কিন্তু ফোনটা ধরতে বেশ আলসেমি লাগছে। দু-তিন বছর আগে অবশ্য এমন হতো না, তখন সব সময় আমি কান পেতে থাকতাম, সম্ভবত এখনো থাকি—কখন ফোনটা বেজে উঠবে। আর বেজে উঠলেই দৌড়ে গিয়ে ফোনটা আমিই প্রথমে রিসিভ করতাম, সে কলটা যারই হোক না কেন।

দৌড়ে গিয়ে ফোন রিসিভ করার একটা কারণ আছে। পার্থকে আমি বলেছিলাম, 'তুমি দিনে অন্তত তিনবার ফোন করবে আমাকে।'

হাসতে হাসতে পার্থ বলেছিল, 'করব, তবে শর্ত আছে।'

আমি বলেছিলাম, 'কিসের শর্ত?'

পার্থ ওর দু হাতের তালু একসঙ্গে করে হাত দুটো ঠোঁটের সঙ্গে ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিল, 'যদি আমার প্রথম ফোনটা তুমি রিসিভ না করো, তবে সেদিন আর ফোন করবো না। যদি করো, তাহলে আরো দুবার তোমাকে ফোন করবো আমি।'

কোনোদিন, কোনোদিনই কখনো ভুল হয়নি আমার। আমি তো জানি, ও কখন ফোন করবে। আমি তো জানি, ও কখন আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমার প্রতিদিনের চাওয়া—ওর প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস আমি শুনতে চাই, ওর প্রতিটা শব্দ আমি আমার অনুভবে মাখতে চাই, ওর প্রতিটা মুহূর্ত বুকের গভীর গোপনে আগলে রাখতে চাই, সযতনে। মন চেয়ে রয় মনে মনে।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। ঝট করে এবার উঠে পড়লাম আমি। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়েই রিসিভারটা তুলে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে কেউ কথা বললো না।

আমি আবার বললাম, 'হ্যালো।'

এবারও কেউ কথা বললো না।

কিছুটা রেগে গিয়ে আমি বললাম, 'আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কথা না বললে ফোন রেখে দেবো আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে বললো, তূর্ণা, কেমন আছেন?'

ভীষণ অবাক হয়ে আমি বললাম, 'কে, কে বলছেন?'

'আমি কে বলছি সেটা তো অবশ্যই বলবো।'

'বলুন।'

'তার আগে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'না, আগে বলতে হবে, আপনি কে?'

'বললাম তো বলবো।'

'না, আগে আপনার পরিচয় দিন।'

খুব মিষ্টি করে হেসে উঠলো ওপাশের ছেলেটি। তারপর বললো, 'মানুষের তো অনেকগুলো পরিচয়, একজন মানুষ হিসেবে আমারও অনেকগুলো পরিচয় আছে। এবার আপনিই বলুন—সবগুলো পরিচয় শোনার সময় কি আপনার আছে?'

'না।' আমি কিছুটা ঝাঁঝালো গলায় বললাম।

'তাহলে?'

'তাহলে ফোনটা আমি এখন রাখবো।'

'রাখবেন?' ছেলেটা খুব কাতর গলায় বললো, 'শুধু একটি কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, মাত্র একটি কথা।'

একটু চুপ থেকে আমি বললাম, 'বলুন।'

আর কোনো কথা বললো না ছেলেটি। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি একটু ধমকের স্বরে বললাম, 'বলুন।'

তবুও কথা বললো না ছেলেটি। আমি কেবল ওর ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, ভালো করে কান পেতে সম্ভবত ওর বুকের শব্দও শুনেছিলাম—মানুষের আসল ভাষা, মানুষের সত্য কথন। তারপর হাসতে হাসতে রেখে দিয়েছিলাম টেলিফোন—'বেচারা!'

ইচ্ছে করে আকাশ ছুঁয়ে দেখি

ছাদ থেকে নিচে তাকাতেই দেখি, শর্মী রিকশা থেকে নামছে। মাথার চুল কেমন এলোমেলো, ওড়নাটাও একপাশে নেমে গিয়ে মাটির সঙ্গে লেগে আছে। অথচ শর্মী খুব গোছানো এবং ফিটফাট।

রিকশা থেকে নেমেই ও পার্স থেকে টাকা বের করে রিকশাওয়ালাকে দিলো। তারপর গেটের দিকে এগিয়ে আসতেই ফিরে তাকালো রিকশাওয়ালার ডাকে। ভাড়া রেখে বাকি টাকা রিকশাওয়ালা বাড়িয়ে দিয়েছে শর্মীর দিকে। আবার অবাক হলাম আমি। শর্মীর তো এমন হওয়ার কথা না, ও তো একটু হিসাবীও।

দ্রুত ছাদ থেকে নেমে আমি ঘরে ঢুকেই দেখি, শর্মী বসে আছে আমার বিছানায়। চোখ দুটো ভীষণ ফুলে গেছে ওর, লালও হয়ে গেছে। আমি পাশে বসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললাম, 'কী হয়েছে তোর?'

শর্মী নাক টেনে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না তো কাঁদছিস কেন?'

চোখ মুছতে মুছতে শর্মী বলল, 'কই কাঁদছি না তো।'

'তুই কি মনে করিস চোখে আমি কম দেখি?'

'না, এমনি।' শর্মী আমার হাত চেপে ধরল, 'আজ ভার্সিটিতে গেলি না যে।'

'কথা ঘুরাচ্ছিস কেন? পরশু এসেও কেঁদেছিস তুই, কিছু বলিসনি আমাকে। আজও কাঁদছিস, কেন?'

মাথা নিচু করে ফেলল শর্মী এবং কাঁদতে লাগলো আবার। ওর কান্না দেখে চোখে পানি এসে গেলো আমারও। আমি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। শর্মী—আমার বন্ধু, আমার প্রিয় বন্ধু। আমরা ভার্সিটির যে সাত-আটটা বন্ধু এক সঙ্গে চলি, তার মধ্যে শর্মীই আমার সবচেয়ে প্রিয়। সেই শর্মী এখন কাঁদছে।

কিছুদিন আগেও কিন্তু শর্মী এমন ছিলো না। আমরা একসঙ্গে আড্ডায় বসলেই শব্দ করে গান গেয়ে উঠতো ও। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়! মাঝে

মাঝে অদ্ভুত রকম করে কিছু কৌতুকও শোনায়। অবশ্য কৌতুকগুলোর অধিকাংশই থাকতো অ্যাডাল্ট। কোথা থেকে যেন ও এসব শুনতো, তারপর আমাদের কাছে এসে বলতো। বলতে বলতে ও এমনভাবে হাসতো, আশপাশের সব মানুষ প্রায় চমকে উঠতো।

শর্মীকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি, কিন্তু সেই শর্মী এখন কাঁদছে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। আমি ওর দু কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'প্লিজ, বল না শর্মী, কী হয়েছে তোর?'

কোনো কথা বললো না শর্মী।

'তোর বাবার যে অসুখটা ছিল, সেটা কি বেড়েছে?' ওর থুতনিটা উঁচু করে ধরে আমি বললাম।

'না।'

'খালাম্মার কোনো সমস্যা?'

'না।'

'তাহলে আসিফ ভাইয়ার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, না?'

কিছু বললো না শর্মী। মাথা নিচু করে ফেললো আবার। আমি আবার ওর থুতনিটা উঁচু করে ধরে বললাম, 'কেন ঝগড়া করেছিস?'

'ইদানীং তো প্রায়ই ঝগড়া হয়।'

হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'ভালোবাসতে গেলে এ রকম টুকটাক ঝগড়াঝাটি হয়েই থাকে। আর কাঁদবিই যখন, তখন ঝগড়া করছিস কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শর্মী গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'ঝগড়া করে তো কাঁদি না। ঝগড়া করে চলে আসার পর ইদানীং ওর জন্য আমার আর খারাপ লাগে না, আমি সেজন্যই কাঁদি।'

বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে আমার। শর্মীর একটা হাত ধরে আমি বারান্দায় দাঁড়াই। মাথাটা উঁচু করে আকাশ দেখতে থাকি, অদ্ভুত নীল আকাশ! আমাদের কষ্ট-ছোঁয়া নীল আকাশ!

ঈ

ঈশান কোণে রঙ লেগেছে, রংধুনরই গায়ে

ব্যাপারটা আমি অনেক দিন ধরেই খেয়াল করছি—মন খারাপ হলেই কোথা থেকে যেন একটা প্রজাপতি আসে আমার ঘরে। প্রজাপতিটা সারা ঘর উড়ে বেড়ায় কিছুক্ষণ। শেষে আমার বিছানার পাশে দেয়ালে গিয়ে বসে। মুগ্ধ চোখে আমি প্রজাপতিটার দিকে তাকাই, রঙিন প্রজাপতি। একটু পর ওর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমি। উড়ে যায় না। বরং ওর ডানাগুলো আরো একটু মেলে দেয় চারপাশে। আমি আরো মুগ্ধ হয়ে যাই এবং খুব আন্তরিকভাবে ওকে বলি, 'তুই কী আমার বন্ধু হবি?'

প্রজাপতিটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে আবার দেয়ালে এসে বসে, 'আমি কি তোমার বন্ধু নই?'

'তুমি আমার বন্ধু।' আমি অবাক হয়ে ওকে বলি।

'বন্ধুই তো। বন্ধু না হলে তোমার যে এখন মন খারাপ, তা জানলাম কী করে?' প্রজাপতিটা ডানা ঝাপটালো।

'আমার মন খারাপ, এটা তুই জানিস?'

'হ্যাঁ জানি। আমি এও জানি, একটু পর তুমি কাঁদবে, একা একা কাঁদবে।'

'কাঁদতে আমার ভালো লাগে যে।'

'কেন ভালো লাগে?'

'কাঁদলে মনে হয় দুঃখগুলো হারিয়ে যায় চোখের জলের সঙ্গে।'

'কী! আমি তো কখনো কাঁদি না।

ভীষণ অবাক হয়ে আমি বলি, 'তোর কোনো দুঃখ নেই?'

'আছে।'

'দুঃখ হলে তোর কান্না আসে না?'

'না।'

'তাহলে দুঃখের সময় তুই কী করিস?'

'আমি উড়ে বেড়াই আর প্রকৃতি দেখি। প্রকৃতি দেখতে দেখতে আমি এক সময় বুঝতে পারি আমার চেয়েও অনেক দুঃখী প্রাণী আছে এ পৃথিবীতে,

আমাদের আশপাশে, আমাদের খুব কাছে। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না, এমনকি দেখেও দেখি না। ওদের দুঃখমালা দেখতে দেখতে আমার আর দুঃখের কথা মনে হয় না, কোনো কষ্ট আর আমার বুকে বাসা বেঁধে থাকে না।'

কথাগুলো বলে প্রজাপতিটা উড়ে চলে যায়। আমি অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকি আর ভাবি—আমার দুঃখ বেশি, না শর্মীর দুঃখ বেশি? গতকাল পত্রিকায় যে দেখলাম—একটা মেয়েকে চার-পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করেছে, তার দুঃখ বেশি, না আমার দুঃখ বেশি? আমাদের বাসার সামনে দিয়ে প্রতিদিন হাড্ডিসার কিছু মেয়ে যে গার্মেন্টসে চাকরি করতে যায়, তাদের দুঃখ বেশি, না আমার? আমাদের কাজের বুয়ার একমাত্র ছেলেটা কথা বলতে পারে না, সারাক্ষণ লালা পড়ে মুখ দিয়ে, আমার দুঃখ কি ওর দুঃখের চেয়েও বেশি?

বিকেল হয়ে গেছে। খুব ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে চুল টেনে বাঁধি আমি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেকে দেখি। তারপর নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, 'তূর্ণা, তুমি কতো ভাগ্যবান একটা মেয়ে, জানো?'

'না, জানি না তো?'

'জানো না!'

'না জানি না।'

'তুমি অনেক ভাগ্যবান এক মেয়ে।'

'কারণ, সন্ধ্যা নামতে নামতেই এ শহরের কয়েকশ মেয়ে সেজেগুজে রাস্তায় নামবে, পেটের খাবার জোগানোর জন্য তারা তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে, তারপর তাদের সস্তা প্রসাধনীর গন্ধের বদলে কোনো পুরুষের বোঁটকা গন্ধ গায়ে মেখে বাসায় ফিরবে। কিন্তু তোমাকে তা করতে হবে না, তোমাকে এসবের কিছু ভাবতেও হবে না।'

চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা লাগে হঠাৎ। হ্যাঁ, আমি তো সত্যি ভালো আছি। এই যে আমি, আমার চারপাশ, সব কিছুই তো অনেক রঙিন, রংধনুর মতো রঙিন।

উ

উচাটনে মন ভরে যায়, তোমার বিহনে

তিন দিন ধরে পার্থর সঙ্গে কথা হয় না আমার। অথচ ও আমাকে প্রতিদিন ফোন করত। বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর জন্য। আজ যদি আমাকে ফোন না করে, তাহলে আজ সরাসরি ওর হলে চলে যাবো আমি।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফোনটা বেজে উঠলো। কিছুটা অভিমান করে বসে রইলাম আমি। কারণ, আমি জানি ফোনটা পার্থ করেছে। ফোনটা না ধরে ওকে একটু টেনশনে রাখা দরকার।

ফোনটা বেজেই চলছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি; তারপর রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে বুড়ো মতো কণ্ঠের একজন বললো, 'এটা কি আলুর বাজার?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথার তালু গরম হয়ে গেলো আমার। কিন্তু আমি শান্ত হওয়ার ভান করে বুড়ো কণ্ঠের লোকটাকে বললাম, 'না, এটা পটলের বাজার।' বলেই রিসিভার রেখে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর ফোনটা আবার বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই সেই বুড়ো লোকটা বলো, 'আম্মাজান, আপনে কি আমার লগে মশকরা করলেন?'

মাথার তালু আবার গরম হয়ে গেলো। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। তবু আগের মতোই শান্ত থেকে বললাম, 'না, আপনার সঙ্গে মশকরা করবো কেন আমি?'

'তাহলে যে কইলেন পটলের বাজার।'

'পটলের বাজার বলেছি, তাতে আপনার অসুবিধা আছে?'

'না, তা নাই ক্যা।'

'তাহলে!'

'না, আসলে আমার নিজের নামই পটল তো, তাই ভাবলাম আমার লগে মশকরা কইরলেন আপনি।'

মন খারাপের মাঝেও ভীষণ হাসি পেলো আমার, একটু অপরাধী অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বুড়ো মানুষ, ওভাবে না বললেও পারতাম।

আবার ফোনটা বেজে উঠলো। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে বুড়ো লোকটা ফোন করেছে আবার। এবার একটু উৎসাহী হয়ে ফোনটা ধরেই বললাম, 'আঙ্কেল আমি স্যরি, আপনার নাম পটল এটা আমি জানতাম না।'

ওপাশ থেকে পার্থ একটু ধমক দিয়ে বলল, 'এই তূর্ণা, এসব কী বলছো?'

জিভ কেটে সঙ্গে সঙ্গে আমি পার্থকে বললাম, 'একটা মিসটেক হয়ে গেছে, পার্থ। স্যরি, রাখি।'

পার্থ আগের চেয়েও ধমক দিয়ে বললো, 'রাখবে মানে?'

'তোমার সঙ্গে আজ আমি কোনো কথা বলবো না।'

খুব নির্ভার কণ্ঠে পার্থ বললো, ' কেন?'

'কেন, তুমি জানো না?' আমি এবার রেগে গেলাম।

'আমি জানি। কিন্তু তুমি জানো না কেন তোমাকে ফোন করিনি এ কয়দিন।'

'কেন করোনি?' গলাটা একটু নরম করে বলি আমি।

'গ্রামে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে পার্থ, কিছু বলে না।

আমি ওকে আবার বলি, 'কথা বলছো না কেন, পার্থ?'

পার্থ এবারও কিছু বললো না, রিসিভারটা রেখে দিলো ওপাশ থেকে।

ঊ

ঊর্মিমালা আছড়ে পড়ে, শুষ্ক বুকের জমিনে

আজ যে ঘুম আসবে না, এটা আমি জানি। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়, ঘুম আসে না। তখন সারা রাত আমি বারান্দায় বসে থাকি। আকাশে চাঁদ দেখি, তারা দেখি। সবচেয়ে বেশি দেখি অন্ধকার। অন্ধকারের যে একটা সৌন্দর্য আছে, অন্ধকারের দিকে ভালোভাবে না তাকালে সেটা বোঝা যায় না।

পাশের ঘরে লাইট জ্বলছে, মানে মা এখনো জেগে আছে। এবং আমি নিশ্চিত জানি—মা প্রতিদিনের মতো আজও ডায়রি লিখছে। মা পারেও—অফিস-ব্যবসা শেষ করার পর প্রায় মধ্যরাতে বাসায় ফেরা, সংসারের টুকটাক সব কিছু দেখে-শুনে নিজের ঘরে ঢোকা, তারপর রুটিন করে প্রতিদিন ডায়রি লেখা—উফ্!

মা ডায়েরিতে কী লেখে, খুব জানার শখ আমার। একদিন মাকে বলেছিলাম, 'প্রতিদিন তুমি কী লেখ, মা?'

হাসতে হাসতে মা বলেছিল, 'সুখের কথা লিখি।'

'কার সুখের কথা?'

'কার আবার, আমার।'

'প্রতিদিন এত সুখের কথা পাও কোথায় তুমি?'

গভীরভাবে মা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমি প্রতিদিন বাসায় ফিরে যখন দেখি আমার মেয়েটা এখনো আমার জন্য জেগে আছে, যখন দেখি অস্বাভাবিকভাবে জন্ম নেওয়া আমার ছেলেটা এখনো বেঁচে আছে, তখন আমার নিজেকে প্রচণ্ড সুখী মনে হয়। সারা দিনের সব ক্লান্তি তখন দূর হয়ে যায়।'

'তুমি তোমার সুখের কথা লেখ, দুঃখের কথা লিখবে না?

'আমার তো কোনো দুঃখ নেই।' মা হাসতে হাসতে বলে।

'তোমার কোনো দুঃখ নেই, না তোমার এত দুঃখ যে ডায়রিতে ধরবে না?'

মা আগের মতোই হাসতে হাসতে বলে, 'সত্যি রে, আমার কোনো দুঃখ নেই।'

রাত অনেক হয়েছে। কোথা থেকে যেন ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ফুলটা চেনার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগলো।

নিঃশব্দে মায়ের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মা, আসবো?'

লেখা বাদ দিয়ে মা আমার দিকে তাকালো। তারপর মিষ্টি হেসে বললো, 'আয়।'

মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মা আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, 'ঘুম আসছে না, না?'

'না।'

'তুই আমার বিছানায় শুয়ে পড়, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম এসে যাবে।'

'না, এখন ঘুমাবো না। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।' মায়ের পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ি আমি।

মা আরো মিষ্টি করে হেসে বলে, 'কার গল্প করবো? তোর না আমার?'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের পেছনে দাঁড়াই আমি। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলি, 'দুজনেরই। আচ্ছা, তুমি কি তোমার ডায়েরিটা আমাকে একদিন পড়তে দেবে?'

'দেব?'

'কবে?'

মা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'ডায়েরিটা আমি তোর জন্যই লিখছি, মা। যেদিন আমি এ পৃথিবীতে আর থাকবো না, ডায়েরিটা তুই সেদিনই পড়িস।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তখন কেন, মা?'

মাথাটা নিচু করে মা গভীর কণ্ঠে বলে, 'কিছু কিছু কথা আছে যা মানুষের মুখোমুখি বলতে হয় না, জানাতেও হয় না।'

ঋ

ঋতু বদলায়, আকাশের রঙ বদলায়, বদলায় মানুষের মন

ভার্সিটিতে গিয়েই দেখি মাঠের এক কোনায় বসে আড্ডা দিচ্ছে শর্মী। একটু পরপর কী যেন বলছে আর হা হা করে হাসছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'খুব মজার একটা কথা আছে তোর সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'বল।'

ও বললো, 'এখন না।'

'কখন?'

হাসতে হাসতে ও বললো, 'এখনই অথবা একটু পরেই কিংবা হয়তো কখনই না।'

খুব ভালো করে আমি শর্মীর দিকে তাকালাম। ও হাসছে। এমনি এমনি হাসছে। আমি ওর একটা হাত ধরে কিছুটা ধমকের স্বরে বললাম, 'এই শর্মী, তোর কী হয়েছে?'

'আমার কী হয়েছে?' বলেই শর্মী আরো হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে সে এক সময় ক্লান্ত হয়ে বলে, 'আমার বিয়ে হয়েছে। হা-হা।'

শর্মীর হাত ধরে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম আমি। তারপর ওকে খুব কাতর গলায় বললাম, 'তোর কী হয়েছে, শর্মী?'

শর্মী আবার হাসতে হাসতে বলে, 'বললাম না বিয়ে হয়েছে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'চা খাবি?'

মাথা কাত করে ও বললো, 'খাবো।'

ফ্লাস্কে করে চা বিক্রেতা করা একটা ছেলেকে চা দিতে বললাম। চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই শর্মী পাগলের মতো হাসতে হাসতে পিচ্চি ছেলেটাকে বললো, 'এই, তুই বিয়ে করেছিস?'

আমি শর্মীর একটা কাঁধ চেপে ধরে বললাম, 'এসব কী বলছিস, শর্মী?'

শর্মী আমাকে পাশ কেটে ওই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, তুই বিয়ে করিসনি? নিশ্চয় করেছিস। আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়ে কয়টা রে?'

চা বিক্রেতা ছেলেটা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দ্রুত ওকে চায়ের দাম দিয়ে আমাদের সামনে থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিলাম। ছেলেটাও কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। আমি চিৎকার করে বললাম, 'ভাগ।' ছেলেটা দৌড়ে চলে গেলো।

একটা মিছিল আসছে ও পাশের রাস্তা দিয়ে। শর্মী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি মিছিলে যাব।'

আমি ওর হাত টেনে ধরে আমার পাশে আবার বসিয়ে বললাম, 'মিছিলে যাবি মানে?'

'মিছিলে যাব মানে—মিছিলে যাব।'

'কেন?'

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন যেতে ইচ্ছে করছে, তুই কি রাজনীতি করিস?'

'না।'

'তাহলে?'

শর্মী হঠাৎ কেমন থরথর করে কেঁপে ওঠে, তারপর আমাকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার বুকের ভেতরটা কেমন জমাট বেঁধে আছে রে!'

ওর গলার কাছে হাত নিয়ে বললাম, 'কেন, কী হয়েছে তোর?'

'কিছু হয়নি রে, কিছু হয়নি।' শর্মী কাঁদতে কাঁদতে কিছুটা শব্দ করে বলে, 'চিৎকার করে আমার এখন অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে, অনেক কিছু।'

এ

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশজুড়ে সজিনার ফুল

ঘরে ঢুকেই দেখি টেবিলে একটা চিঠি পড়ে আছে। কাছে গিয়ে হাতে তুলে নিয়ে দেখি আমার চিঠি। সাদা খামের ওপর অদ্ভুত সুন্দর করে আমার নাম আর ঠিকানা লেখা। প্রথম প্রথম পার্থও আমাকে এ রকম মুক্তার অক্ষরে চিঠি লিখত।

পার্থকে একদিন বলেছিলাম, 'তোমার সঙ্গে তো আমার প্রায় দিনই দেখা হয়, চিঠি লেখো কেন?

'চিঠি লিখি কেন? চিঠিতে আমার না বলা কথাগুলো লেখা থাকে।'

'কেন, আমরা যখন কথা বলি, তখন কথাগুলো বললে কী হয়!'

'কিছুই হয় না।'

'তাহলে?'

'তোমার সঙ্গে যখন থাকি, তখন তো অনেক কথাই বলি। কিন্তু চলে আসার পরই মনে হয়, অনেক কথাই বলা হয়নি তোমাকে।'

পার্থর প্রতিটা চিঠি আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। ওর প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য আমি গভীরভাবে খেয়াল করতাম।

দরজার কাছে শব্দ হতেই ফিরে তাকিয়ে দেখি তমাল দাঁড়িয়ে আছে। ও অনেক ছোট এবং আমাদের কাজের বুয়ার ছেলে হলেও অমি ওকে ভাইয়া ডাকি। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম, 'কিছু বলবি, ভাইয়া।'

মাথাটা উঁচু নিচু করলো তমাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেশ কিছু লালা ঝড়ে পড়ে ওর গায়ে। আমার ওড়না দিয়ে লালা মুছতে মুছতে বললাম, 'কি, আজ তোকে টিভি দেখতে দেয়নি?'

মাথাটা এবার এদিক-ওদিক করলো তমাল।

বুয়াকে কথাটা বলতেই বুয়া বললো, 'আম্মাজান ওকে বেশি টিভি দেখতে নিষেধ করছে।'

'কেন?'

'ওর চোখে অসুবিধা হয়েছে।'

'অ।'

তমাল কথা বলতে পারে না, কিছু করতেও পারে না। সারাক্ষণ মুখ দিয়ে লালা পড়ে ওর। আমরা কেউ-ই যখন বাসায় না থাকি, বুয়া বুয়ার মতো কাজ করে, আর ও তখন বাসায় থেকে কেবল টিভি দেখে। বেশী টিভি দেখার ফলে সম্ভবত চোখে কোনো অসুবিধা হয়েছে ওর।

অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তমাল। ভীষণ মায়া হলো আমার। আমি ওকে আমার বিছানায় বসিয়ে আমার রুমের টিভিটা ছেড়ে দিলাম। কার্টুন চ্যানেলটা দিতেই দেখি টম অ্যান্ড জেরির কার্টুন দেখাচ্ছে। তমাল সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো।

টেবিল থেকে চিঠির খামটা হাতে নিলাম আবার। খুব সাবধানে সেটা ছিঁড়ে বের করে আনি চিঠিটা। ভাঁজ খুলে চিঠিটা মেলে ধরতেই কিছুটা চমকে উঠলাম । সমস্ত কাগজে মাত্র একটা লাইন লেখা—

> সজিনার ফুলের মতো আপনার যে সৌন্দর্য, তার মাঝে লুকিয়ে থাকা দুঃখগুলো কি আমাকে দেবেন?
>
> —সেই ছেলেটা যে ছেলেটা প্রায় রাতে টেলিফোনে আপনাকে বিরক্ত করে।

মনটা হঠাৎ কেন যেন ভালো হয়ে গেল আমার, চোখে পানিও এসে গেল। জানালা দিয়ে আকাশে তাকিয়ে দেখি, সারা আকাশে কেবল নীল মেঘ, মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড কিছু সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার কেন যে মনে হলো—ওগুলো মেঘ না, ওগুলো ফুল, সজিনার ফুল!

ঐ

ঐকতান বাজে মনে, ক্ষণে ক্ষণে... ক্ষণে ক্ষণে

টেলিফোনটা ধরতেই ছেলেটা বললো, 'আমার চিঠি পেয়েছেন?'

আমি একটু রাগ হওয়ার ভান করে বললাম, 'কোনো মেয়ের কাছে এত রাতে কেউ ফোন করে?'

'না, কোনো ভদ্র ছেলে অন্তত করে না।'

'তাহলে আপনি করলেন যে!'

'আমাকে আপনি অভদ্র বলতে পারেন। আর— ।'

'আর?'

'আপনি তো প্রায়ই এত রাতে জেগে থাকেন।'

'জেগে থাকলেই ফোন করতে হবে?'

'না, তা করতে হবে না।'

গলাটা গম্ভীর করে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, কী বলবেন ঝটপট বলুন, আমি ঘুমাবো।'

'আমি আপনাকে যা বলতে চাই, তা তো ঝটপট করে বলা যাবে না।'

'কেন?'

ছেলেটি মিষ্টি করে হেসে বললো, 'সব কথাই কী ঝটপট বলা যায়?'

'ঠিক আছে, ধীরে ধীরেই বলুন, কিন্তু তাড়াতাড়ি বলবেন।'

'আপনি কী আমার চিঠিটা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'পড়েছেন চিঠিটা?'

'পড়েছি।'

'ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার নেই, আমি রাখি এখন?'

গলাটা আগের মতোই গম্ভীর করে বললাম, 'আপনি জানেন সজিনার ফুল দেখতে কেমন?'

'না।'

'তাহলে লিখলেন যে!'

'আমার কেন যেন মনে হয় সজিনার ফুল দেখতে খুব সুন্দর।'

'সজিনার ফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

'আপনিও যে সুন্দর!'

'এ ধরনের সস্তা কথা আপনারা মানে ছেলেরা বলে কীভাবে? '

'বলে কীভাবে?' ছেলেটা একটু হেসে বললো, 'তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?'

'করুন।'

'আমার খুব আন্তরিক অনুরোধ, প্রশ্নটার আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।'

'আগে প্রশ্নটা করুন।'

'ওই সস্তা কথাটা শুনে আপনার একটুও কী ভালো লাগেনি?'

জানালার কাছে একটা মানিপ্লান্ট গাছ আছে আমার। ঝট করে আমি গাছটার দিকে তাকাই। প্রতিদিন একটু একটু করে গাছটা বড় হচ্ছে। অথচ একদিনও আমি গাছটার পাতা ছুঁয়ে বলিনি—তুই খুব সুন্দর!

আমি জানি না গাছকে সুন্দর বললে গাছ খুশি হয় কি না। কিন্তু আমি এ মুহূর্তে জেনে গেলাম—কথাটা শুনলে মানুষ খুশি হয়। তারপর নিজের সুন্দরের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা সুন্দর মনে হয় তার। সুন্দর সুন্দর...।

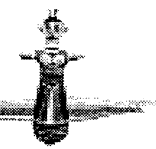

ও

ওকি এলো, ওকি এলো না

পার্থ এ রকমই—মন খারাপ থাকলে ও কথা বলতে বলতে চুপচাপ টেলিফোনটা রেখে দেয়। আমি জানি এটা। তাই ওভাবে ফোন রেখে দিলে আমার আর মন খারাপ হয় না, একদমই হয় না।

পার্থ কতদিন এভাবে টেলিফোন রেখে দিয়েছে! কিছুক্ষণ পর মনটা ভালো হলেই ও আবার ফোন করেছে। ওর এই মধুর পাগলামিটা আমি উপভোগ করতাম। কারণ ভালোবাসলে তো মানুষ পাগলই হয়!

পার্থর সঙ্গে আমার কয়েকদিন ধরে দেখা নেই। দ্বিতীয়বার বোধ হয় এ রকম হলো। এর আগে একবার তিন দিন ও আমার সঙ্গে দেখা করেনি, এমনকি ফোনও করেনি। ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল ওর জন্য। কয়েকজন বন্ধু মিলে ও একটা মেসে থাকত তখন। একদিন সকালে খুঁজে খুঁজে ওর মেসটা বের করলাম আমি, আমার সঙ্গে শর্মী ছিল। পার্থদের ঘরের দরজাটা খটখট করতেই ভেতর থেকে একজন বললো, 'কে?'

আমি বললাম, 'আমি তূর্ণা।'

ভেতর থেকে আবার বললো, 'কে?'

আমি আবার বললাম, 'আমি তূর্ণা।'

'কার কাছে এসেছেন?'

'পার্থ আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর কেমন যেন শব্দ শুরু হয়ে গেল। বাইরে থেকেই আমি টের পাছিলাম—সবাই ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠছে, কেউ বিছানা গোছাচ্ছে, কেউ টেবিল পরিষ্কার করছে, কেউ মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজাটা পার্থই খুলে দিলো। ওর চোখে তখনো ঘুম লেগে আছে। আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'তুমি ভালো আছো?'

আমার স্বাভাবিক কথা শুনে পার্থ বেশ ভড়কে গেল। ওই মুহূর্তে ও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। একবার ঘরের ভেতর তাকায়, একবার আমার দিকে তাকায়। শেষে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এমন করছ কেন, পার্থ?'

আমতা আমতা করে পার্থ বললো, 'না, এমনি।'

আমি একটু রাগের ভান করে বললাম, 'এমনি মানে কী?'

পার্থ আবার বলল, 'না এমনি।'

'কি এমনি এমনি করছ?' পার্থকে ঠেলে আমি ঘরের ভেতর ঢুকলাম এবং ঢুকেই প্রচণ্ড হাসি পেল আমার। সারা ঘর এলোমেলো। পার্থর পড়ার টেবিলটাও এলোমেলো। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্থর দিকে তাকালাম, 'ভালো আছো?'

'হ্যাঁ।' পার্থ কেমন যেন তোতলাতে লাগলো, 'কিন্তু তুমি, মানে তুমি এত সকালে!'

'তোমাকে দেখতে এলাম।'

'কেন?'

'কেন, তুমি জানো না! টেলিফোন করছো না কেন আমাকে?'

'এমনি।'

'এমনি কেন?'

পার্থ এবার হেসে ফেলল, 'তোমাকে কতদিন আমার এখানে আনতে চেয়েছি, কিন্তু আসতে চাওনি। নিয়াজদের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলাম, সাত দিনের মধ্যে আমি তোমাকে আমার বাসায় আনব।'

'বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে তাই আমার সঙ্গে দেখাও করোনি, ফোনও করোনি, যাতে আমি একা একাই তোমার বাসায় এসে খোঁজ নেই, এই তো?'

মুচকি হেসে পার্থ বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি ওর বুকে দুটো কিল দিয়ে বললাম, 'খুব খেলতে শিখেছো না!'

ও আমার মাথায় চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলল, 'না খেললে আসতে না যে।'

পার্থ কি এবারও আমার সঙ্গে খেলছে! কিন্তু ওর তো এখন খেলার কথা না! কিন্তু ও আমাকে ফোনও করছে না, দেখাও করছে না। প্রতিদিন আমি যখন বাসায় থাকি, তখন আমি আমাদের গেটের দিকে তাকিয়ে থাকি। গেটে একটু শব্দ হলেই আমি ভাবি—এই বুঝি পার্থ এলো, এই বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে আমি কত্তো ভালোবাসি, জানো?'

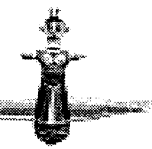

ঔ

ঔদাসীন্যে আজ, বাউল হয়ে যায় মন

কোনো কোনো দিন কিছুই করতে ইচ্ছে করে না, কিছুই না। আলস্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি একদম। চোখের সামনে যা আসে তাকিয়ে থাকি একদৃষ্টিতে, কিন্তু কিছুই বলি না। ভাল্‌লাগে না, ভাল্‌লাগে না।

আজ আমার কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না।

জানালার ধারে এসে প্রতিদিন যে দোয়েল পাখি দুটো কিচির মিচির করে, আজ তার সঙ্গেও কথা বলতে ইচ্ছে করবে না; টেলিফোনটা বেজে যাবে আজ তারই মতো; সেটা ধরতে ইচ্ছে করবে না আজ মোটেই। দৈনিক পত্রিকাটা পড়ে থাকবে আমার স্পর্শের অপেক্ষায়, আমি সেটা ছুঁয়েও দেখবো না আজ।

কী আশ্চর্য! এ রকম প্রতিটা দিনই মা আমার ঘরে এসে চুপচাপ বসে পড়ে আমার পাশে। তারপর আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অনেকক্ষণ পর বলে, ‘এক সপ্তাহে কয়টা দিন, বল তো?’

বোকার মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে বলি, ‘সাত দিন।’

‘সাত দিনের একটা দিন ভালো না লাগলে, বাকি থাকে কয় দিন?’

‘ছয় দিন।’

‘তাহলে মানে কী দাঁড়ালো?’

‘কিসের মানে, মা?’

‘মানুষের এক দিন ভালো না লাগতে পারে, বাকি ছয় দিন তো ভালো লেগেছে। আমরা বরং সে ছয় দিনের কথা ভাবি এবং ভালো থাকি।’ মা হাসতে থাকে।

কথাটা শুনেই আমি মার বুকের কাছে মুখ লুকাই। মা আমাকে পরম মমতায় জড়িয়ে রাখেন নিজের সঙ্গে। অনেকক্ষণ পর আমি টের পাই—মার বুকের ভেতর আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছি আমি, গলে যাচ্ছে আমার ভালো না লাগা সময়। অদ্ভুত, কী অদ্ভুত!

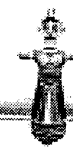

ক

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে

পার্থকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আমি। পরক্ষণেই একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। তারপর ওর দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে বললাম, 'ভুল করোনি তো, পার্থ!'

কিছুটা চমকে ওঠে পার্থ, আর সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ করে হেসে ওঠে। আমি আবার গভীরভাবে তাকালাম। ওর চোখে আমার চোখ পড়তেই মুখের হাসিটা আরো লম্বা করার চেষ্টা করে ও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর হাসিটা বড্ড ম্লান দেখায়। সে ম্লান হাসিতে পার্থ বলে, 'তোমার কি মনে হয় আমি ভুল করেছি?'

'আমার তো ইদানীং অনেক কিছুই মনে হয়, পার্থ।'

'আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি, তূর্ণা।'

'আমি জানি।'

'তুমি জানো!'

'এতো আশ্চর্য হচ্ছো কেন, পার্থ?'

'বিধাতা মেয়েদের তিনটে চোখ দিয়েছেন। তাদের একটা চোখ থাকে বুকের ভেতর, একেবারে বুকের গভীর ভেতরে। সে চোখ দিয়ে সে সব দেখতে পায়, স-ব।'

'আমি আসলে...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে পার্থকে আমি থামিয়ে দেই, 'ভেবো না, পার্থ। ভেবো না তোমাকে সে ভুল নিয়েই আমি থাকতে বলবো, বরং একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাকে সে ভুল শোধরানোর পরামর্শ দেবো।'

'তূর্ণা, তুমি কি আমার সব কথা শুনবে?'

'তোমার সব কথাই তো আমি জানি, পার্থ। কারণ তুমি আর আমি মিলে স্বপ্ন তো একসঙ্গেই দেখেছি। আমাদের স্বপ্নগুলো বড্ড সরল ছিল পার্থ, না?'

'তোমার কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে, তূর্ণা।'

'কষ্ট পাওয়া ভালো। কষ্ট মানুষকে মহৎ করে আবার নষ্টও করে। আশা রাখি এ কষ্টটা তোমাকে মহৎ করবে। আর তুমি তো জানোই, মহৎ লোকেরা

সাধারণত ভুল করে না। আশা রাখি তুমিও আর ভুল করবে না।'

'এত ভুলের কথা আসছে কেন, তূর্ণা?'

'আমরা ভুল করি যে।'

দু চোখে গাঢ় বিষাদ এনে পার্থ আমার চোখের দিকে তাকায়। আমি চোখ আবার নিচু করে ফেলি। ও আমার দিকে একটু এগিয়ে আসে। তারপর প্রথম ছোঁয়ার মতো কাঁপা কাঁপা হাতে আমার একটা কাঁধ ছুয়ে বলে, 'আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো, তূর্ণা।'

পার্থর হাতের ওপর আমার একটা হাত রেখে আমি বলি, 'না, তোমাকে পাগল হতে হবে না, পার্থ। তুমি যা সিদ্ধান্ত দিয়েছো, ভাবো, সেটাই সঠিক, সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।'

'সিদ্ধান্তটা আমি নিইনি।'

'সিদ্ধান্তটা তুমি নাওনি, কিন্তু সিদ্ধান্তটা তোমাকে নিয়ে ফেলেছে। তুমি তাই এখন সে সিদ্ধান্তের পথেই চলছো, তোমার মন চলছে, ভাবনা চলছে; আশা রাখি তোমার নতুন স্বপ্নগুলোও চলবে।'

'তূর্ণা, তুমি কথাগুলো আগে শোনো— ।'

'প্লিজ।' হাত দিয়ে ইশারা করে থামতে বললাম আমি পার্থকে।

'একটা কথা অন্তত শোনো।'

'বললাম না পার্থ, কথাটা আমি জানি।'

'তবুও একটু শোনো।' কাতর গলায় বললো পার্থ।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি পার্থর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, 'যতটুকু স্বপ্ন আছে, স্বপ্নটুকু আরো একটু থাকতে দাও, পার্থ। তোমার কথাটা না হয় অন্য একদিন শুনি।'

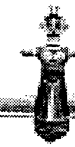

খ

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার, রাঙাও চোখের মণি

শর্মী হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'একটা কথা বলি?'

আমি হেসে বললাম, 'বল।'

'তুই রাগ করবি না তো!'

'রাগ করবো কেন, বল।'

'আজ ক্লাস করবো না, চল আজ সিনেমা দেখে আসি।'

আমি শর্মীর হাতটা ছাড়িয়ে বললাম, 'পাগল হয়েছিস নাকি!'

শর্মী অবাক হয়ে বললো, 'কেন?'

'ক্লাস বাদ দিয়ে কেউ সিনেমা দেখে!'

'কেউ না দেখুক, আমরা দেখবো।'

আমি এবার গম্ভীর হয়ে বললাম, 'পাগলামি সব সময় ভালো লাগে না, শর্মী।

'তাহলে কী ভালো লাগে?' অভিমানী কণ্ঠে শর্মী বললো।

মুখটা হাসি হাসি করে আমি শর্মীকে কিছুটা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ঠিক আছে, সিনেমা না, চল, আজ আমরা সারা দিন রিকশায় করে বেড়াবো।'

শর্মী বললো, 'চল।'

মেইন রাস্তায় গিয়ে শর্মী একটা রিকশাওয়ালাকে ডেকে বললো, 'আজ আপনার কতো টাকা ইনকাম হয়েছে, ভাইজান?'

রিকশাওয়ালাটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো, 'জি।'

'আমি বলছি, আজ আপনার কতো টাকা কামাই হয়েছে।' ছোটদের বুঝানোর মতো করে শর্মী রিকশাওয়ালাকে বললো।

একটু ভেবে রিকশাওয়ালাটি বললো, 'চল্লিশ টাকা।'

'গুড।' পার্স থেকে একটি এক শ টাকার নোট বের করে শর্মী রিকশাওয়ালাটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'যদি আমরা আপনাকে এই পুরো এক শ টাকা দেই, তাহলে আপনি আমাদের কতো ঘণ্টা রিকশায় করে বেড়াবেন?'

'জানি না।'

'জানেন না মানে!'

'ঘণ্টার হিসাব তো আমি জানি না, আপা।'

'অ। ঠিক আছে, যদি আপনাকে আমরা এমনি এমনি এ টাকাটা দিয়ে দেই, তাহলে আজ আপনি এ টাকাটা দিয়ে কী করবেন?

'এমনি এমনি আপনার টাকা নেবো কেন, আপা?'

'যদি অনুরোধ করি?'

'তাও নেবো না।'

রিকশাওয়ালাটি শরম পাওয়া হাসিতে বললো, 'আপা, আপনি এমনভাবে কথা বলেন, আমার শরম লাগে।'

'এই যে আপনি আমাকে আপা ডাকলেন, আমি আপনাকে ভাইজান ডাকলাম, তাহলে এখন টাকাটা আপনার নেওয়া উচিত। তাই না?'

'আপা, আপনি এমনভাবে বলেন!'

শর্মী রিকশাওয়ালাটির হাতে টাকাটা প্রায় জোর করে দিয়ে বললো, 'এবার বলুন এ টাকাটা দিয়ে আপনি কী করবেন?'

সারা মুখ শরমে ভরে গেলো রিকশাওয়ালাটির। সে শরম পাওয়া চেহারা নিয়েই বললো, 'বহুদিন আগে বউ একটা লাল শাড়ি চেয়েছিল, ওকে আজ শাড়িটা কিনে দেবো।'

'তাহলে তো এই এক শ টাকা দিয়ে হবে না।' শর্মী ওর পার্স থেকে আরো একটি এক শ টাকার নোট বের করে জোর করে রিকশাওয়ালার হাতে দিলো। তারপর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বললো, 'তোর একটা লাল শাড়ি আছে না?'

'আছে।'

'তুই কি আমাকে আজ অদ্ভুতভাবে সাজিয়ে ওই লাল শাড়িটা পরিয়ে দিবি।'

ছলছল করা শর্মীর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'এসব তুই কী বলছিস, শর্মী?'

সারা চোখ পানিতে ভরে শর্মী বললো, 'আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি রে!'

গ

গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে

জানালার পাশে বসে আছি আমি। খুব ঘুম পাচ্ছে আমার, কিন্তু ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না একদম। আকাশে আজ চাঁদ নেই, তেমন তারাও নেই, কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে আছে এদিক-ওদিক। দরজার কাছে খুট করে শব্দ হতেই বললাম, 'কে?'

'আমি।'

'মা?'

'হ্যাঁ!'

দ্রুত উঠে গিয়ে আমি দরজাটা খুললাম। মা হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। মাকে জড়িয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'তুমি এখনো ঘুমাওনি!'

'ঘুমিয়েই পড়েছিলাম প্রায়। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো তোকে একটু দেখে আসি।'

মাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই আমার ঘরের ভেতর এনে বললাম, 'তুমি কি আজ আমাকে একটা গল্প বলবে?'

'কিসের গল্প বলবো, বল?'

আমার বিছানার ওপর মাকে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাদের গল্প।'

'আমাদের তো অনেকা গল্প, কোন গল্পটা বলবো বল?'

'তোমার যে গল্পটা বলতে ভালো লাগবে।'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলো মা। বেশ কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'তুই যখন আমার পেটে এসেছিস, তখন আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম।'

'তুমি এ স্বপ্নের কথা অনেকবার বলেছো, মা। তুমি স্বপ্ন দেখতে এক অপরূপ পরি এসে প্রতিদিন তোমার ঘরে বসে থাকে।'

'তার পরেরটুকু কী বলেছি?'

'না, বলোনি।'

'না, সেটুকুও আজ বলবো না। তোকে বরং অন্য একটা গল্প শোনাই।'

'সে গল্পটা কি আমাদের গল্প, মা?'

'না, সেটা অন্য গল্প।'

'আমি সে গল্পটা শুনবো না, মা। আমি আমাদের গল্প শুনবো।'

'আমাদের সব গল্প আমার ডায়রিতে লিখেছি, সে গল্পগুলো তো তুই একদিন জানতেই পারবি। আমি বরং তোকে গল্প না, আমার একটা মনের কথা বলি।'

'বলো।'

'আমার খুব শখ—আমি একদিন এক খোলা মাঠে শুয়ে থাকবো। আমার মাথার নিচে থাকবে নরম কচি সবুজ ঘাস, ওপরে বিশাল আকাশে জ্বলজ্বলে চাঁদ। আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি। মিষ্টি মিষ্টি বাতাসে গা জুড়িয়ে যাচ্ছে আমার, আমি তাকিয়েই আছি চাঁদের দিকে। হঠাৎ কেউ একজন এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, বাতাস আমাকে সত্যি সত্যি শরীরটা জুড়িয়ে দিয়ে গেছে, সত্যি সত্যি আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু সে বাতাস আর এখন আমি অনুভব করছি না, স্থির চোখে সে চাঁদও আমি দেখছি না।'

ঘ

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে, আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে

জানালার পাশে দুটো দোয়েল বসে আছে, চুপচাপ। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভালো হয়ে গেলো আমার। বিছানায় বসেই আমি ওদের একটু শব্দ করে বললাম, 'কেমন আছো তোমরা?'

ওরা কী বুঝলো জানি না, পুরুষ দোয়েলটি লেজ নাড়িয়ে শব্দ করলো—চিউ।

আমি আবার বললাম, 'তোমরা কেমন আছো?'

পুরুষ দোয়েলটি আবার শব্দ করলো—চিউ।

মেয়ে দোয়েলটি চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। আমি এবার মেয়ে দোয়েলটিকে বললাম, 'মন খারাপ?'

লেজ নাড়লো মেয়ে দোয়েলটি।

আমি বললাম, 'কেন?'

ঘাড় ঘুরিয়ে আবার আমাকে দেখে দুটো দোয়েলই উড়ে চলে গেলো।

আচ্ছা, পাখিদের কি কোনো দুঃখ আছে? পাখিরা কি একে-অপরকে কখনো ভুলে যায়?

খুব দুঃখী দুঃখী গলায় পার্থকে একবার বলেছিলাম, 'যদি তোমাকে ছেড়ে আমি কোনোদিন চলে যাই, তাহলে কি দুঃখ পাবে?'

সঙ্গে সঙ্গে ও বলেছিল, 'একটা কবিতা শুনবে?'

'কার কবিতা?'

'নির্মলেন্দু গুণের।'

'বলো।'

'হাত বাড়িয়ে ছুঁই না তোকে
মন বাড়িয়ে ছুঁই,
দুইকে আমি এক করি না
এককে করি দুই।

হেমের মাঝে শুই না যখন
প্রেমের মাঝে শুই।

তুই কেমন করে যাবি?
পা বাড়ালেই পায়ের ছায়া,
আমাকে তুই পাবি।
তবুও তুই বলিস যদি যাই,
দেখবি তোর সমুখে পথ নাই।
তখন আমি একটু ছোঁব
হাত বাড়িয়ে জড়াবো তোর
বিদায় দুটি পায়ে,
তুই উঠবি আমার নায়ে
আমার বৈতরণী নায়ে।

নায়ের মাঝে বসবো বটে
না-এর মাঝে শোব;
হাত দিয়ে তো ছোঁব না মুখ
দুঃখ দিয়ে ছোঁব।
তুই কেমন করে যাবি?'

কতদিন পর কবিতাটা মনে পড়লো আমার!

হঠাৎ দেখি একটা প্রজাপতি এসে আমার টেবিলের ওপর বসেছে। আমি একটু এগিয়ে বললাম, 'কী খবর?'

প্রজাপতিটা হাসতে হাসতে বললো, 'তুমি কী আমায় ভালোবাসো?'

চ

চিত্ত আমার হারালো আজ কারো চিত্তের মাঝে

'আজকের দিনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী, জানেন?' টেলিফোনের ওপাশ থেকে গমগম করে কথাটা বললো ছেলেটি।

'জানি না।'

'একটু ভেবে বলুন।'

'ভেবেছি, কিন্তু বলতে পারছি না'।

'বলতে পারছেন না!' ছেলেটা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বললো, 'ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আজকের দিনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে—আজ আমি বেঁচে আছি, আপনিও বেঁচে আছেন।'

কিছুটা বিরক্তি নিয়ে আমি বললাম, 'এতে আশ্চর্যের কী হলো?'

'বারে, এটা আশ্চর্য একটা ঘটনা নয়! আজকে সারা পৃথিবীতে অন্তত কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছে, এমনকি এ মুহূর্তেও মারা যাচ্ছে, অথচ কী আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি, আপনিও।'

'জীবনে আপনার খুব বেঁচে থাকার শখ, না?'

'হ্যাঁ, অনেক অনেক। তবে একা না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে। আচ্ছা, ইদানীং আপনি স্বপ্ন দেখেন?'

'না।'

'স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'না।'

'কেন?'

'স্বপ্নগুলো ভেঙে যায় বলে।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো ছেলেটি। তারপর বললো, 'স্বপ্ন তো ভেঙে যাওয়ার জন্যই। স্বপ্ন ভাঙার পরই তো মানুষ আরেকটা স্বপ্ন দেখতে পারে।'

'সবাই কি পারে?'

'হ্যাঁ, সবাই পারে।'

'আপনার কখনো স্বপ্ন ভেঙেছে?'

'আমি তো কখনো স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্ন দেখা কেবল শুরু করেছি।' মিষ্টি করে হাসলো ছেলেটি।

'এবার বুঝবেন স্বপ্নভঙ্গের কী জ্বালা।'

শব্দ করে এবার হেসে উঠলো ছেলেটি। বেশ কিছুক্ষণ হাসার পর ও বললো, 'কখনো চাপা পড়া দূর্বাঘাস দেখেছেন?'

'না।'

'স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে চাপা পড়া দূর্বাঘাসের মতো। ঘাস চাপা পড়ে একদিন, দু দিন কয়েকদিন ফ্যাকাশে হয়ে থাকে, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার সবুজ হয়ে ওঠে, কেবল একটি নীল ফুল ফোটাবে বলে।'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি ছেলেটার কথা শুনে। কেন যেন চোখে পানিও এসে গেল আমার। এ মুহূর্তে ছেলেটাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। আমি একটু সময় নিয়ে ওকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনার নামটা কী?'

'সুবর্ণ।'

'সুবর্ণ!'

'হ্যাঁ, সুবর্ণ। জীবনের অনেক কিছুই বর্ণহীন হবে বলেই বোধহয় বাবা-মা শখ করে নাম রেখেছিলেন সুবর্ণ।'

'তাই! তা একটা জীবন বর্ণিল করতে কী কী লাগে?'

'কিছু না, কেবল কেউ একজন একদিন পাশে এসে বসবে। তারপর আর কিছু না, কিচ্ছু না।'

'আর কিছুই না?'

'না।' আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুবর্ণ বললো, 'কেউ এসে পাশে বসলে, সমস্ত পৃথিবীই তখন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, একদম কাছে এসে দাঁড়াবে।'

আমি আবার মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর কথা শুনে, মুগ্ধতায় চোখ দুটো আবার ভিজে গেলো আমার।

ছ

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা

কোনো কোনো দিন আমার খুব একা লাগে, খুব একা। তখন আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাকি। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমার ওয়াল কেবিনেটটা খুলি। অদ্ভুত একটা গন্ধ পাই আমি সঙ্গে সঙ্গে। মুগ্ধ চোখে ভেতরে তাকিয়ে দেখি—আমার প্রিয় জিনিস, আমার প্রিয় জিনিস সব। জিনিসগুলো একে একে আমার বিছানায় নিয়ে আসি।

অনেকদিন আগে পার্থ আমাকে একটা নীল রঙের নেইলপলিশ কিনে দিয়ে বলেছিল, 'যেদিন খুব মন খারাপ থাকবে, সেদিন এটা নখে মেখো, দেখবে আমি পাশে আছি।'

কথাটা শুনে আমি হেসে বলেছিলাম, 'নেইলপলিশ মাখলেই তুমি পাশে থাকবে, আর কখনো থাকবে না?'

'আমি কি সব সময়ই থাকি না?'

'তাহলে?'

পার্থও হাসতে হাসতে বললো, 'এমনি বললাম। নেইলপলিশের মতো আমিও কি তোমার জীবনের সঙ্গে মিশে নেই?'

কতোদিন আগে পার্থ এ কথাটা বলেছিল? পার্থর কি কথাটা এখনো মনে আছে?

নেইলপলিশের শিশিটা হাতে নিয়ে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কোনোদিন আমি নেইলপলিশটা ব্যবহার করিনি। আজ ব্যবহার করলে কেমন হয়? কথাটা ভাবতে ভাবতেই আমি শিশির মাথাটা খুলে ফেললাম। চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। সব নেইলপলিশ শুকিয়ে গেছে। চৈত্রের বাতাসের মতো সবকিছু শুকনো, খটখটে।

হায়! আমার জীবনের মতোও কি!

জ

জানি না কোথায় তুমি—শরের ভেতরে সন্ধ্যা যেই আসে

আমার ঘরে একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার আছে, ক্যালেন্ডারটা কয়েক বছরের পুরনো। কিন্তু ফেলে দেই না সেটা। যত্ন করে রেখে দিয়েছি আমার টেবিলের পাশে।

ক্যালেন্ডারটার আজকের তারিখটার দিকে তাকালাম আমি। চারপাশে গোল দাগ দেওয়া আছে তাতে। এ দিনটায় পার্থ আমাকে একটা কথা দিয়েছিল। ও বলেছিল—প্রতি বছর এ দিনটার পুরোটা সন্ধ্যা ও আমার সঙ্গে কাটাবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে মজা লাগছে এখন। মাঝেমধ্যেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে, মন জুড়িয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি বারান্দায়, আমার মন বলছে–একটু পরেই পার্থ চলে আসবে, আর এসেই বরাবরের মতো হাসতে হাসতে বলবে, 'আমি আমার কথা রেখেছি, তুমি?'

চার বছর আগে পার্থ যখন আমাকে এ কথাটা বলেছিল, আমিও হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'আমিও রেখেছি।'

ও বলেছিল, 'দেখি।'

পা দুটো মেলে দিয়েছিলাম আমি। মুগ্ধ চোখে ও তাকিয়ে ছিল আমার পায়ের দিকে। ওর মুগ্ধ চোখ দুটো দেখতে দেখতে আমি বলেছিলাম, 'মেয়েরা কেন নূপুর পরে, জানো?'

'না।'

'নূপুর হচ্ছে মেয়েদের সভ্য শৃঙ্খল।'

পার্থ মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে বলেছিল, 'বুঝলাম না।'

খুব আবেগ নিয়ে ওর একটা হাত ধরে আমার পাশে বসিয়ে বলেছিলাম, 'কয়েক শ বছর আগেও মেয়েদের পায়ে কয়েকটা করে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো?'

'কেন?'

'যাতে মেয়েরা কোথাও চুপিচুপি হেঁটে গেলেও শব্দ হয়। মানে ওটা ছিল ওদের শৃঙ্খল।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে পার্থ আমাকে বলে, 'আজও মেয়েরা পায়ে সেসব শৃঙ্খল পরছে, পরে মজা করছে, কেন?'

গভীর চোখে পার্থর দিকে তাকিয়ে আমি বলেছিলাম, 'মেয়েরা তো জন্ম থেকেই শৃঙ্খলিত!'

কথাটা শুনে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল বোধহয় পার্থ। ও আলতো করে আমার পায়ে হাত রাখলো, তারপর ঝট করে নূপুর দুটো খুলে ফেলে বললো, 'আমি আমার ভালোবাসা দিয়েই তোমাকে শৃঙ্খলিত করতে চাই, নূপুর দিয়ে নয়।'

নূপুর দুটো আমি ফেলতে দেইনি, আমি প্রতি বছর এ দিনটায় সে নূপুর দুটো পরি, আর ওর জন্য অপেক্ষা। আজও করছি।

ঘরে ফোন বাজছে। হঠাৎ মনে হলো ফোনটা পার্থই করেছে। দ্রুত ঘরে গিয়ে ফোন ধরতেই অফিস থেকে মা বললো, 'আজ তুই কারো জন্য অপেক্ষা করছিস, না?'

আমি ম্লান হেসে বললাম, 'সেটা তো তুমি জানো, মা।'

'যদি কখনো দেখিস, প্রতীক্ষার পরও কাঙ্ক্ষিত সে মানুষটা আসেনি, তবে তার মঙ্গল কামনা করিস।'

'কেন?'

'মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই তার নিয়তির কাছে বাঁধা।'

'আমিও?'

'তুই তো মানুষই, না কি?'

ফোনটা রেখে দিলাম আমি। হ্যাঁ, আমি তো মানুষই। মানুষ বলেই তো— এখনো অপেক্ষা করে আছি; কেবল মানুষই বোধহয় অপেক্ষা করতে জানে, আর মানুষই জানে প্রতীক্ষার প্রহর কতো আনন্দের, কতো কষ্টের!

ঝ

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারই দলে

বুকের ভেতরটা যখন খুব বেশি মুচড়ে ওঠে, তখন আমি ইদানীং গল্প লিখতে বসি। ঠিক কার গল্প লিখতে বসি, তা বুঝতে পারি না, তবে লিখতে থাকি। কিন্তু কোনোদিনই সম্পূর্ণ একটা গল্প লেখা হয়ে ওঠে না আমার।

বেশ কয়েক দিন ধরে ভাবছি আমাদের কাজের বুয়ার ছেলেটাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবো। সাক্ষাৎকারের মতো একটা গল্প। আমি ওকে প্রশ্ন করবো, ও উত্তর দেবে। যদিও ও কথা বলতে পারে না, তবু। আমি জানি এ গল্পটাও আমার লেখা হবে না কোনোদিন। আচ্ছা, শর্মী আর আসিফ ভাইয়াকে নিয়ে একটা গল্প লিখলে কেমন হয়। হ্যাঁ, আজ আমি শর্মীকে নিয়ে একটা গল্প লিখবো। গল্পের নাম দেবো—পুনর্নির্মাণ।

গল্পটা হবে এ রকম—

পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে শর্মীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আসিফ, আসিফ বিন রশীদ। সেই সকাল থেকে একটানা দাঁড়িয়ে আছে সে এখানে, কেবল শর্মীকে একপলক দেখবে বলে, শুধু শর্মীকে একটা কথা বলবে বলে।

আসিফ ইচ্ছে করলে এ দেড় ঘণ্টার মধ্যে শর্মীকে ডেকে কথাটা বলতে পারতো। কিন্তু সে পণ করেছে—শর্মী একা একাই দরজা না খোলা পর্যন্ত, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি এর জন্য সারা দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়, তবু এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দু ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই শর্মী হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই চমকে ওঠে, তার বুকের হৃদস্পন্দন থেমে যায় অল্পক্ষণের জন্য। অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথাটা নিচু করে ফেলে সে।

কিছুক্ষণ পর আসিফ খুব অপরাধী অপরাধী গলায় বলে, 'ভেতরে আসতে বলবে না?'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় শর্মী।

মুখটা হাসি হাসি করে আফিস বলে, 'না, মুখে না বললে ভেতরে যাবো

না।'

মুখ তুলে শর্মী পূর্ণ চোখে এবার আফিসের দিকে তাকায়; তারপর ভেজা ভেজা গলায় বলে, 'আসো।'

ঘরের ভেতর ঢুকেই ভীষণ চমকে ওঠে আসিফ। শর্মীর খাটের পাশে দেয়ালে একটা ছবি ঝুলানো আছে তার। বেশ কয়েকদিন আগে শর্মীকে দিয়েছিল আসিফা। ছবিটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আসিফ ভাবে—শর্মী তাকে এখনো ভালোবাসে!

ম্লান গলায় শর্মী বলে, 'ওভাবে কী দেখছো?'

কিছুটা লজ্জা পেয়ে আসিফ বলে, 'কিছু না।'

শর্মী একটু হাসার চেষ্টা করে, 'কেবল তোমার ওই ছবিটা ঝুলানো দেখেই চমকে উঠলে? তোমার সমস্ত অস্তিত্বটা আমি যে আমার বুকের ভেতর রেখেছি, সেটা দেখেছো?'

'আমি দুঃখিত, শর্মী!'

চোখ দুটো বুজে ফেলে মাথা নিচু করে থাকে শর্মী। ঘরের দরজা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে, এলোমেলো করে দিচ্ছে সবকিছু!

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে শর্মী আসিফের দিকে তাকায়, 'এতোদিন কেমন ছিলে?'

'ঝরা পাতার মতো। এখানে-ওখানে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছি, ঠাঁই হয়নি কোথাও।'

চোখ দুটো ভিজে ওঠে শর্মীর, তার নিজের দুঃখে নয়, তার প্রিয় মানুষটির দুঃখে। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যায় আসিফের দিকে। তারপর নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলে, 'এই জায়গাটা এখনো তেমনই আছে, সে আসনটা এখনো খালি আছে। কেবল তুমি আসবে বলে, তুমি আবার ফিরে আসবে বলে।'

মনটা অসম্ভব ভালো হয়ে গেল আমার। আজ আমি একটা গল্প লিখতে পেরেছি, শর্মীর গল্প। হায়! গল্পের মতোই যদি শর্মী সবকিছু ফিরে পেতো!

ট

টলমল করে চোখের মণি, অজানা কারণে

ভার্সিটি থেকে বাসায় ফেরার সময় বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম একদিন। পিঠে হঠাৎ একটা স্পর্শ পেতেই বেশ বিরক্তি নিয়ে পাশে তাকালাম। ময়লা কাপড় পরা লোকটাকে দেখে বললাম, 'চোখে দেখেন না!'

বৃদ্ধ লোকটি কাতর মুখে বলেছিল, 'না মা, আমি অন্ধ।'

'অ।' বেশ অপরাধী মনে হলো নিজেকে। পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম, 'দুঃখিত।'

লোকটা তার কাঁপাকাঁপা একটা হাত আমার দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'সুখে থাইকেন মা, বহুত সুখে থাইকেন।'

গতকাল শর্মী আমাকে ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিল, 'সুখী হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় কী, জানিস?'

'কী?'

'সবকিছু ভুলে থাকা।'

'তুই কি এখন সুখী?'

'হ্যাঁ, আমি এখন খুব সুখী।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি বললাম, 'বুকের ভেতরে তোর যে একটা দাগ আছে, সেটা ভুলতে পেরেছিস?'

'জানি না। তবে আমার কষ্টগুলো এখন আমার হৃদয় ছোঁয় না। সবকিছু মেনে নিয়ে আমি এখন যে জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি—সেখান থেকে পৃথিবীর সবকিছুকে আমার রুঢ় মনে হয়। মা মাঝে মাঝে মাথায় হাত রেখে বলে, তুই এভাবে আসিফকে ছেড়ে এলি কেন? আমি বলি, নিয়মগুলোকে অনিয়মের বঞ্চনা থেকে বাঁচিয়ে দিতে। ভেঙে যাওয়া মন যে ভাঙা কাচের মতোই কখনো আর জোড়া লাগে না, এটা আমি স্বীকার করে নিয়েছি। যেমন স্বীকার করে নিয়েছি—বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে দুঃখ, আর বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা অস্বীকার করাই হচ্ছে সুখ।'

ঠ

ঠায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে, আলোর খোঁজে মরি

সুবর্ণ আমাকে ইদানীং প্রতিদিনই ফোন করে। সম্ভবত ওর ফোনের জন্য আমি কিছুটা অপেক্ষাও করি এখন। আমার একাকিত্বের প্রহরে ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালোই লাগে।

দরজায় শব্দ করে ঘরে ঢুকলো মা। চারপাশটা ভালো করে দেখে আমার বিছানায় বসে বললো, 'তোর মানিপ্লান্ট গাছের বোতলের পানি তো কমে গেছে।'

আমি মায়ের পাশে বসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

মা আমার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। অনেকক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি আমি।'

'আমি জানি।'

'তুই জানিস!'

'হ্যাঁ, আমি জানি।' আমি মায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলি, 'তুমি তো কখনো এমনি এমনি আমার ঘরে আসো না, মা।'

'তাহলে কেন আসি?' মা কপাল কুঁচকে বলে।

'অশ্যই কিছু বলতে আসো।'

হেসে ফেলেন মা, 'তোর ঘরে আমার সব সময়ই আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমার মনে হয় একটা মানুষের বেশির ভাগ সময় একা থাকা উচিত। একাকিত্ব মানুষকে আনন্দ দেয়।'

'তুমি তো তোমার কথা বললে।'

'হয়তো, আমি একা একা থেকে বুঝে গেছি—একা থাকাটা কতো আনন্দের, কতো প্রশান্তির!'

'তুমি একটা কথা বলতে এসেছো আমার ঘরে।' মাকে স্মরণ করে দেই আমি।

পূর্ণ চোখে মা আমার দিকে তাকায়; তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'কোনো কিছু নিয়ে কখনো ভেঙে পড়বি না। সব হচ্ছে নিয়তি।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'না, অনিবার্যতা।'

মা হেসে হেসে বলে, 'নিয়ম যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন সেটাই তো অনতিক্রম্য নিয়তি।'

আমি অস্ফুট স্বরে মার দিকে তাকিয়ে বলি, 'হয়তো।'

'আমরা হচ্ছি অনিবার্য ঘেরাটোপে বদ্ধ মানুষ—আমরা অন্তর্গত ভাঙন দেখি প্রতিনিয়ত, দেখি আবার অনাকাঙ্ক্ষিত পুনর্নির্মাণ।'

মাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আমি কিছুটা উদগ্রীবের মতো প্রশ্ন করি, 'মা, মানুষ কি কখনো বদলায়?'

'না, বদলায় তার আকাঙ্ক্ষাগুলো।'

মা আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমিও ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আজকের রাতটা বেশ অন্ধকার। আজকাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় চোখ বুজে ফেলি। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু হাতের তালু একত্র করে থুতনির সঙ্গে ঠেকাই, অপেক্ষা করি—একটি বিশুদ্ধ সকালের, একটি বিশুদ্ধ স্পর্শের।

আমি নিশ্চিত—সে বিশুদ্ধ সকাল একদিন আমার আসবেই, একটি বিশুদ্ধ স্পর্শ এসে আমাকে আরো শুদ্ধ করবেই!

ড

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে

পার্থর কণ্ঠ শুনেই সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। কতদিন পর ওর কণ্ঠ শুনলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আমি বললাম, 'কিছু বলবে, পার্থ?'

'হ্যাঁ।' খুব দুঃখী গলায় বললো পার্থ।

'বলো।'

'তোমাকে একটা অনুরোধ করবো আমি, রাখবে?'

'কথাটা তুমি বুঝে বলছো?'

'মানে?'

'গত কয়েক বছরে আমি তোমার কোন অনুরোধটা রাখিনি বলো তো?'

'স্যরি।' পার্থ একটু হেসে বলে, 'তোমার হারমোনিয়ামটার ওপরে এখন কতো ইঞ্চি ধুলো জমেছে, দেখেছো?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। অনেক দিন সেটা নিয়ে বসা হয় না।'

'গান গাওয়াটা ছেড়ে দিলে?'

'অনেক কিছুই ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'তা তো জানি না। কেবল জানি—আমি যেমন অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি, অনেক কিছু আবার আমাকে ছেড়েও চলে গেছে।'

পার্থ আমাকে একটা অনুরোধ করেছে—আমি যেন আজ ওর সঙ্গে একটু দেখা করি। বরাবরের মতো আজও ওর অনুরোধটা রেখেছি আমি।

ইকোপার্কের পেছনের মাঠটায় বসে আছি আমি, একটু পরেই পার্থ এসে পড়বে। কতো দিন আমরা এ পার্কটিতে এসে বসেছি। কতো গল্প করেছি, কতো স্বপ্ন বুনেছি!

পার্থর পছন্দের নূপুর জোড়া পড়েছি আজ পায়ে, কপালে ছোট্ট টিপ পরেছি, নীল রঙের নেইলপলিশ লাগিয়েছি হাতে, পার্থ আমাকে পছন্দের একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল, সে শাড়িটাও পরেছি আজ।

বেশ কিছুক্ষণ পর পার্থ এলো। এসেই অপরাধীর মতো চেহারা করে বসে পড়লো সামনে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই ভীষণ চমকে উঠলাম। একি চেহারা করেছে ও, সারা মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি!

আমি একটু রূঢ়ভাবেই বললাম, 'এখন তো তোমার খারাপ থাকার কথা না, পার্থ। চেহারাটা এমন করে ফেলেছো কেন?'

কিছু বললো না পার্থ, মাথা নিচু করে ফেললো ও। আমি ওর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, 'ডেকেছো কেন?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো আমি, ঠিক কথা না, একটা চিঠি দেবো তোমাকে।'

'সম্ভবত, আমি জানি, ও চিঠিতে কী লেখা আছে।'

'না, তুমি সব জানো না।'

'জানি না!'

'না, জানো না।'

আমি হাত পাতলাম পার্থর সামনে, পার্থ ওর পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিলো। আমি সেটা আমার পার্সে দিলাম।

চুপচাপ বসে আছি আমরা, কেউ কোনো কথা বলছি না। হঠাৎ পার্থ একটু সোজা হয়ে বসে বললো, 'এতো সেজেছো কেন তুমি?'

আমি একটু হাসলাম, তারপর বললাম, 'কারো পছন্দের সাজে এসে আমি কেবল জানাতে চেয়েছি—একদিন আমিও কারো ছিলাম।'

পার্থ কী যেন বলতে চাচ্ছিলো। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'সম্ভবত তোমার সঙ্গে আজই আমার শেষ দেখা, তাই না?'

ঢ

ঢের হয়েছে রাতের প্রহর, তবু তোমায় ডাকিনি

অন্ধকার বারান্দায় একা একা বসে আছি আমি। কোথাও একটা রাতের পাখি ডেকে ওঠে। কিছুটা চমকে আমি সামনের দিকে তাকাই। রাতের সাক্ষী হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার লাইটপোস্টগুলো। ডাস্টবিনের পাশে এতো রাতেও ভিড় করে আছে অনেকগুলো নেড়ি কুকুর। বাঁশি বাজিয়ে কোথাও কোনো পাহারাদার জেগে আছে আপন মনে। আর একটু পর পর ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে গায়ে। সম্ভবত বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথাও।

ঘরের ভেতর ফিরে এলাম। টেবিলে রাখা পার্থর চিঠিটা আবার মেলে ধরলাম শেষবারের মতো। মুক্তোর মতো অক্ষরে ও চিঠিটা লিখেছে আমাকে।

চিঠিটা আবার পড়লাম, আবার ঘেমে গেলো আমার সারা শরীর। পার্থর কথাটা ঠিক না—ও বলেছিল, এ চিঠিতে যা লেখা আছে তার আমি কিছুই জানি না; কিন্তু সবকিছুই আমি আগে থেকেই জানতাম। এ চিঠির সবকিছু পার্থ ওর বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শুনেছে, যা আমি অনেক দিন থেকেই ওকে বলতে চেয়েছি। ও শুনতে চায়নি, কোনোভাবেই শুনতে চায়নি।

কথাটা জানার পর পার্থ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ও লিখেছে ও নেয়নি, ওর বাবা-মা নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারটাও আমি অনেক আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। আমার মন বলছিল—পার্থ আর কোনোদিন আমাকে ডাকবে না, আমার কথা শুনবে না, আমার আঙুলগুলো টেনে দেবে না, শেষে আমার কপালে নেমে আসা চুলগুলো আঙুল দিয়ে খুব যত্ন করে সরিয়ে দিয়ে বলবে না—তুমি এতো ভালো কেন কন্যা, কন্যা তোমাকে ছুঁয়ে আমি পাথর হতে পারি!

এ মুহূর্তে প্রচণ্ড হাসি আসছে আমার। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এখন হাসতে ইচ্ছে করছে। এই নিঝুম রাতের সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে আমি এখন হাসবো। হাসবো, আমি আমার ইচ্ছে মতো হাসবো। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, মায়ের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, মানে মা এখনো ডায়েরি লিখছে। আমার খুব ইচ্ছে করছে, দৌড়ে মায়ের ঘরে যাই, তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে

চিৎকার করে বলি, 'মা, তুমি কি আমায় দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারো, অনেক দূরে, অনেক-অনেক দূরে!'

আমাকে আর মায়ের ঘরে যেতে হয় না। মা খুব ধীর পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মায়ের একটা হাত ধরে আমি খুব কাতর গলায় বলি, 'মা, চাঁদটা কি এখনো মেঘে ঢেকে আছে?'

আলতো করে মা আমার কপালে হাত রেখে বলে, 'চল, আমরা আজ সারা রাত ঘুমাবো না, আমরা আজ নতুন ধরনের একটা গল্প শুনবো, গল্প শুনতে শুনতে তুই সুখে ঘুমিয়ে যাবি।'

মায়ের দিকে আমি পূর্ণ চোখে তাকাই। মা কাঁদছে। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুটা চিৎকার করে বলি, 'সুখের গল্প শোনার আগে কি কেউ কাঁদে?'

চোখ দুটো মুছতে মুছতে মা বলে, 'কাঁদছি না।'

সুখী মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে এখন, তারা স্বপ্নও দেখছে হয়তো। পৃথিবীজুড়ে এখন জীবনানন্দের জ্যোৎস্না! সে জ্যোৎস্নায় ভিজে যায় রাত, ভিজে যায় আমাদের চোখ, ভিজে যায় আমার হৃদয়।

সমর্পণের বিহ্বলতা নিয়ে ঝরে পড়া সে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে আমি মায়ের বুকে মুখ লুকাই!

ত

তুমি একটু কেবল বসতে দিও পাশে

খুব ভোরে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। বেশ বিরক্তি নিয়ে ফোনটা ধরে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললাম, 'কে?'

শঙ্কা আর দ্বিধা নিয়ে সুবর্ণ বললো, 'আমি।'

'এতো সকালে!'

'স্যরি।'

'ওকে।'

'কিছুক্ষণ আগে একটা স্বপ্ন দেখলাম তো, খুব ভালো স্বপ্ন।'

'খুব ভালো স্বপ্ন!'

'খুবই ভালো স্বপ্ন। জানেন, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়?'

'না।'

'কেন?'

'ভোরে কখনো স্বপ্ন দেখিনি তো।

'স্বপ্নে আমি কী দেখেছি জানেন?'

'না।'

'শুনবেন?

'না।'

হতাশ হওয়ার শব্দ শোনা যায় ওপাশ থেকে। তারপর খুব নরম গলায় সুবর্ণ বলে, 'কেন?'

'কোনো ভালো স্বপ্নের কথা শোনা মানেই সেই স্বপ্নে নিজেকে সম্পৃক্ত করা।'

'স্বপ্নে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে এতো অনীহা কেন?'

'স্বপ্নভঙ্গের ভয়ে।'

'কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনাকে তো স্বপ্ন দেখতেই হবে।'

কিছুটা শব্দ করে বলি, 'কেন?

'কারণ স্বপ্ন দেখে না যন্ত্রেরা।'

গত সন্ধ্যায় বুয়ার ছেলেটা আমার ঘরে এসেছিল, আমি ওকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছি। অথচ দুদিন আগেও ওকে একটু উঁচু স্বরে কিছু বলার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না।

যে দুটি দোয়েল এসে প্রতিদিন আমাকে সঙ্গ দিতো, কাল বিকেলে ওদের আমি তাড়িয়ে দিয়েছি আমার জানালা থেকে।

প্রজাপতিটা কাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত বসে ছিল আমার বিছানার পাশে দেয়ালে, আমি একটা কথাও বলিনি ওর সঙ্গে।

মানিপ্লান্ট গাছটার বোতলে পানি দেওয়া দরকার, বোতলটা এখনো প্রায় খালিই রয়েছে আগের মতো।

বিছানা থেকে নেমে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্যান্য দিনের মতো সকালের শীতল হাওয়া আমাকে আর মুগ্ধ করছে না। আমার বারান্দা থেকে যে সবুজ ঘাস দেখা যায়, প্রতিদিনের মতো সে ঘাসও দেখতে ইচ্ছে করছে না আজ। সকালের আকাশে কাশফুলের মতো সাদা মেঘগুলোও আমাকে আর টানতে পারছে না।

তবে কি আমি সত্যি সত্যি যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি!

বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এলাম আমি। ড্রয়ার থেকে নেইলকাটারটা বের করে একটা আঙুলের মাংসে চেপে ধরলাম। লাল জবার মতো টকটকে লাল রঙে ভেসে যাচ্ছে আমার বিছানার সাদা চাদর।

সঙ্গে সঙ্গে আমি হেসে উঠলাম। কারণ যন্ত্রদের কোনো রক্ত থাকে না!

থ

থমকে আছো আঁখির পরে

নিজেকে আমার আজ খুব অচেনা মনে হচ্ছে। এই প্রথম আমি আমার অস্তিত্বজুড়ে টের পাই ঘৃণার নারকীয় উল্লাস। এই প্রথম ক্রোধের অগ্নিতে স্নান করেও আমি পড়ে থাকি নিশ্চুপ। এ কোন আমি?

তবে কি আমি হেরে গেলাম? মায়ের মতো? তবে কি আমিও ধীরে ধীরে গড়বো এক কুৎসিত বিষাদের দুর্গ?

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমার। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত বাতাস আজ উধাও, মনে হয় ঘাতকের বিষমাখা ছুরি আমার বুকে আমূল বসিয়েছে কেউ। অতল সমুদ্রে ডুবতে থাকা অবলম্বনহীন মানুষের অসহায় হাত যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত, তেমনি করে আমিও আরেকবার হাতে নিই চিঠিটা। সুবর্ণর চিঠি—

তূর্ণা

কে বলে হারিয়েছো সব! আয়নার সামনে দাঁড়াও। চোখের তারায় তাকিয়ে দেখো—সেখানে কেমন খেলা করে চকচকে চৈত্রের রোদ। তোমার যে অস্তিত্বে তুমি বিষ দেখছো, সেই অস্তিত্বেই দেখো মিশে আছে মায়ের ভালোবাসার অমৃত। বুকে হাত দাও, টের পাবে অন্তহীন উচ্ছ্বাসের স্মৃতি—মাকে ঘিরে, বন্ধুদের ঘিরে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেভাবে রুখে দাঁড়ায় আক্রান্ত দুর্বল, তেমনি করেই রুখে দাঁড়াতে পারো—যেটুকু সম্বল আছে সেটুকু নিয়েই। কিংবা আকণ্ঠ ডুব দিতে পারো স্বপ্নের সমুদ্রে, আর পারো ভীষণ বদলে যেতে। এক ফুঁতে উড়িয়ে দিতে পারো স্মৃতির ওপারের মলিন পৃথিবী। বাতাসে নিঃশ্বাস নাও—টের পাবে সামনে নূহের প্লাবন, অনাগত ধ্বংস, আরেকটা নতুন পৃথিবীর আমূল উদ্বোধন। শুধু একবার ডাকো, দেখবে, ভীষণ সাহসী হবো আমি—তোমাকে ভরিয়ে দিতে। দেখবে, তোমার হাতে হাত রেখেই ওড়াবো সুখের শুভ্র কপোত, ভালোবাসার নীল আকাশে।

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে আরেকবার।

সুবর্ণ কি পারবে আমাকে বাঁচিয়ে দিতে? পারবে কি নতুন কোনো স্বপ্ন দেখাতে? দৃষ্টির অদূরে যে হৃদয় সে কি ছুঁয়ে দিতে পারবে আবার?

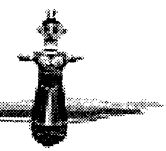

দ

দুঃখ দিয়ে মেটাই দুঃখ আমার

'খুব ভুল করে থাকলে আপনি আমাকে পুরো এক মিনিট একটানা বকে দিতে পারেন। কিন্তু এই নতজানু মনে আমি কেবল এটাই বলতে চাই—আমি ঈশ্বরের কাছে হাত পাতিনি, আমি প্রকৃতির পানে চেয়ে থাকিনি, আমি অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য প্রহরও গুনিনি। আমি স্বয়ং এসেছি এখানে, আপনার কাছে, এক মানবীর কাছে, যেখানে আমার সমস্ত অস্তিত্ব থমকে আছে অজানা অতঙ্কে। তূর্ণা, আপনি কি আমার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, ঝড়ে পড়া পাখির আকুল আর্তনাদের শব্দ!'

সুবর্ণর প্রতিটি কথা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম। ও হঠাৎ আমাদের বাসায় চলে এসেছে। ড্রইংরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো এবং কথাগুলো বললো। কথাগুলো বলার সময় ভীরু মানুষের মতো একটুও কাঁপতে দেখিনি ওকে। কথাগুলো বলার সময় মেরুদণ্ড একটুও কুঁজো হয়ে আসিনি ওর, মুখের টান টান চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি একটুর জন্যও। পূর্ণ চোখে আমি সুবর্ণর দিকে তাকালাম, সঙ্গে সঙ্গে বুকের গভীর গোপনে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল আমার, টুপটুপ টুপটুপ।

'সুবর্ণ, আপনি বসুন। আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি।'

'আমি শুধু মায়ের কাছে না, আপনার কাছেও এসেছি।'

'আমি জানি আপনি আমাকে কী বলবেন, কিন্তু মা জানে না, মাকে আপনি কী বলবেন।'

'আপনি জানেন আমি আপনাকে কী বলতে এসেছি, কিন্তু আমি তো জানি না আপনি আমাকে কী বলবেন।'

দু পায়ে বেশ ভর করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালাম, চোখ দুটো বুজে ফেললাম, তারপর এক মুহূত ভেবেই বলে ফেললাম সবকিছু। আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সবকিছু এক করে আমি খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললাম, 'মা হচ্ছে আমার বন্ধু। একজন বন্ধুই জানে আরেক বন্ধুর মনের কথা!'

মা অনেকক্ষণ ধরে ড্রইংরুমে গেছে, সুবর্ণর সঙ্গে কথা বলছে মা। আমি আমার ঘরে বসে তেমন শুনতে পাচ্ছি না কথাগুলো। এক ধরনের উৎকণ্ঠায় ভুগছি আমি—মা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে?

আধা ঘণ্টা পর মা আমার ঘরে এলো। মাথা নিচু করে আছি আমি। মা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। চমকে উঠে মায়ের দিকে তাকাতেই মনটা ভালো হয়ে যায় আমার। আমার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'সুবর্ণকে কতোদিন ধরে চিনিস তুই?'

'ফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু আজই প্রথম দেখা হলো।'

মা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'কিন্তু ওকে আমি অনেক দেখেছি, দেখেছি ওর বাবা-মাকেও। ওরা আমাদের সব জানে।'

আমি মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলি, 'তারপরও!'

মা ম্লান হেসে বলে, 'ঈশ্বরের এতো বড় পৃথিবী, সব মানুষ কি এক!'

ধ

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো

মা আজ সুবর্ণদের বাসায় যাবে। সমস্ত দিন তাই উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছি—মা কখন আসবে, মা কখন এসে আমাকে সব বলবে, স-ব।

বুয়ার ছেলেটাকে আমি আজ জড়িয়ে ধরেছিলাম। ওর মুখের লালা আমি আজ যত্ন করে মুছে দিয়েছি আমার ওড়না দিয়ে। তারপর ফ্রিজ থেকে আমার প্রিয় পুডিং বের করে খেতে দিয়েছি ওকে। কিছুক্ষণ পর ওকে বলেছি, 'কাল তোকে ধমক দিয়েছিলাম, তুই কি রাগ করেছিস?'

ও কিছু বলে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

দোয়েল দুটো আজও এসেছিল আমার জানালায়। আমি ওদের দিকে খুব দুঃখী দুঃখী চোখে তাকিয়ে থেকেছি অনেকক্ষণ। তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেছি, 'ভুল তো মানুষই করে, তাই না?'

পুরুষ দোয়েলটা লেজ নাড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দোয়েলটাও লেজ নাড়ায়। আমি খুব আনন্দ নিয়ে বলি, 'তোরা ভালো আছিস?'

দোয়েল দুটো একসঙ্গে বলে—চিউ।

প্রজাপতিটি আজ আমার ঘরে ঢোকেনি প্রথমে, বারান্দায় গ্রিলে বসে ছিল অনেকক্ষণ। আমি ওর কাছে গিয়ে বলেছি, 'বন্ধুর ওপর রাগ করে থাকে কেউ?'

কথাটা শুনেই প্রজাপতিটি ঘরে চলে আসে। তারপর দেয়ালে বসেই আমাকে বলে, 'মনটা আজ খুব ভালো, না!'

আমি হেসে হেসে বলি, 'জানি না।'

মানিপ্লান্ট গাছটার সবগুলো পাতা আজ মুছে দিয়েছে সাদা কাপড় দিয়ে। বোতল পরিষ্কার করে নতুন পানি ভরেছি সে বোতলে। তারপর ওর পাতাগুলো ছুঁয়ে বলেছি, 'এত সবুজ তোর গায়ের রঙ, এতো সুন্দর কেন তুই!'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটু পর মা চলে আসবে বাসায়, আমার তখন সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু যাবো না। আমার লজ্জা করে না বুঝি!

টেলিফোন বেজে উঠলো হঠাৎ। দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরতেই সুবর্ণ ওপাশ

থেকে হাসতে হাসতে বললো, 'মা এসেছিলেন বাসায়।'

আমি কিছুটা কপট রাগ নিয়ে বলি, 'কোন মা?'

'যে এখন তোমার মা, সম্ভবত সে মাটা এখন আমারও।'

'সুবর্ণ, আপনাকে আমার কিছু কথা বলার আছে।'

'আমি জানি।'

'কী জানেন আপনি?'

'জানি—পৃথিবীতে বিশুদ্ধ হচ্ছে একমাত্র মানুষের মন, আর কিছু না, আর কিচ্ছু না।'

'সুবর্ণ, আপনাকে কথাগুলো বলা দরকার আমার।'

'আমি কেবলই বিশুদ্ধ সেই মনের কথা শুনতে চাই, মনের কথা! আচ্ছা তূর্ণা, তুমি কি জানো—আজ পৃথিবীর সব ফুল ফুটেছে আমাদের জন্য!'

ন

নয়ন, তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নও মাঝে

ঘুম ভাঙতেই চারপাশটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। চোখ দুটো ভালোভাবে মেলতেই বুঝতে পারলাম রহস্যটা। গত রাতে কখন যে মার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেই নেই।

মার এই ঘরটা আমার একধরনের আশ্রয়। আমার ছোট্ট জীবনের একেবারে নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

মন খারাপ হলে সবার আগে আমার মার ঘরটার কথাই মনে পড়ে। আমি জানি একমাত্র মা-ই পারেন আমার সমস্ত কষ্টের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে। রাতে ঘুম না এলে কিংবা ভয় পেয়ে কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিই মায়ের বুকে। এ কি কেবল ছোটবেলার অভ্যাস বলে, নাকি গর্ভের উষ্ণতার উত্তাপ এখনো মায়ের বুকে পাই বলে? বুঝি না, আমি কিছুতেই বুঝি না!

শুয়ে শুয়ে অসংখ্যবার দেখা এই ঘরটাকে আমি আবার দেখতে থাকি। এ ঘরের সবকিছু আমার চেনা, সবকিছু। জানালার পর্দা থেকে শুরু করে দেয়ালে ঝুলানো ছবি, লেখার টেবিল থেকে শুরু করে পানি খাওয়ার মগ, এমনকি মায়ের ছেড়ে যাওয়া কাপড়ে তার গায়ের গন্ধ পর্যন্ত। কেবল ওই কালো ডায়েরিটা ছাড়া। কী আছে ওই ডায়েরিতে?

'কী ভাবছিস এতো?' মা এসে আমার পাশে বসতে বসতে বলে। আমি কিছুটা চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নিই। মুখে ছোট্ট হাসি ছড়িয়ে তাকিয়ে থাকি মায়ের দিকে।

'তুই কি জানিস, কখনো কখনো নীরবতাই একটা শব্দের চেয়েও লক্ষ গুণ ভারী হয়ে ওঠে?' কথাটা বলেই আমার কপালে চুমু খায় মা।

আমি আবারও চমকে উঠি। ভেতরটা পড়ে ফেলার এই অদ্ভুত ক্ষমতা কে দিয়েছে মাকে? তার দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা নাকি তার মাতৃত্ব?

পরিবেশটা হালকা করার জন্য আমি বলি, 'আজকের তারিখটা মনে আছে তো, মা?'

'অবশ্যই। আর এও মনে আছে, কদিন পর আমার মেয়েটা আমার পর হয়ে যাবে।'

মাথাটা মায়ের বুকে ঠেকাই আমি, 'এভাবে বলো না, মা। বুকটা ফাঁকা হয়ে যায়,

একদম ফাঁকা।'

আমার মুখটা হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে মা, চোখের কোণে জমে থাকা জল মুছিয়ে দেয় যত্ন করে। আমি সরাসরি মায়ের চোখের দিকে তাকাই, 'আজ তুমি আমাকে একটা মহামূল্যবান উপহার দেবে বলেছিলে, কই দেবে না?'

মা তার পাশে রাখা ছোট্ট প্যাকেটটা তুলে দেয় আমার হাতে। অপেক্ষা সহ্য হয় না আমার। ঝটপট প্যাকেটটা খুলে ফেলি। একটা ছোট্ট লাল বাক্স। আমি একবার মায়ের দিকে তাকাই, মা হাসেন, এবার আমি বাক্সটাও খুলে ফেলি—একটা নাকফুল, বিশেষত্বহীন, সাদা পাথরের ছোট্ট নাকফুল।

দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে আমি মায়ের দিকে তাকাই। মা আবারও হাসেন, 'ভাবছিস, এই কমদামি ছোট্ট জিনিসটা মহামূল্যবান উপহার হলো কী করে, তাই না?'

আমি চুপ করে থাকি, মা আমার একটা হাত ধরেন, 'শোন তূর্ণা, তোকে দেওয়ার মতো আজ আমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যে ছোট্ট জিনিসটা আঁকড়ে ধরে আমি এতোটা কাল বেঁচে আছি, তোকে বুকে ধরে বেঁচে আছি, তার চেয়ে মহামূল্যবান আর কিছু কি হয়, বল? তাই আজ তোকে এই নাকফুলটাই দিলাম।'

আমার মাথাটা নুয়ে আসে লজ্জায়, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। খুব জোরে মাকে আমি জড়িয়ে ধরি, 'আমি কি পারবো, মা?'

'কী?'

'আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে?'

'শোন্ মা, মনে রাখবি, ফেলে আসা সময়ে আর কেউই কখনো ফিরতে পারে না, তাহলেই দেখবি–সামনের পথটা অনেক বেশি অবারিত, আরো বেশি সুন্দর।'

'আমার নতুন জীবন শুরু করার সব দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম, মা।'

'না।' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে মা, 'আমি চাই সেই দায়িত্ব তোরা দুজনে মিলে নিবি, তুই আর সুবর্ণ। স্বপ্ন দেখার আহ্লাদ, স্বপ্ন পূরণের সুখ ভাগ করে নিবি দুজনে মিলে। আস্তে আস্তে নতুন জীবনটাকে ভালোবাসতে শিখবি তোরা।'

বুকের ভেতরটা অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে যায় আমার। ইচ্ছে করে মাকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, মা।'

কথাটা বলার জন্য আমি মায়ের একটা হাত ধরি, 'তুমি কি জানো মা, আমি...।'

আমাকে থামিয়ে দেন মা, 'আমি জানি।'

'কীভাবে?'

মা হাসেন, তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে যান রুমের বাইরে।

আমি কেবল তাকিয়ে দেখি আমার অসম্ভব দৃঢ়, স্বাধীনচেতা মাকে। যাকে কোনোদিন আলাদা করে দেখার প্রয়োজনই হয়নি। এই ঘরদোর-আসবাবে যিনি মিশে থাকেন প্রতিনিয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-আবদার ছাপিয়ে যার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না কখনোই। কেবল আমার সকল সংশয় আর সংকটে সেই মা বুঝিয়ে দেন—তিনি আছেন, আমার সর্বস্ব জুড়ে আছেন।

প

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি

আজকের পরিকল্পনাটা জানানো হয়নি সুবর্ণকে। দুবার ফোন করেছিল ও। বলি বলি করেও বলা হয়নি কথাটা।

সুবর্ণ প্রায়ই বলে, 'তুমি আজকাল কম কথা বল, তূর্ণা।'

আমি হাসি।

আমার একটা হাত মুঠোবন্দি করে ও, 'যখন আমার ফোন পেয়ে তুমি খুব বিরক্ত হতে, রেগে গিয়ে বকা দিতে, তখন কথার পিঠে অনেক কথা বলতে তুমি।'

'এখনো কি বকা দেবো তাহলে?' দুষ্টুমি করি আমি।

'দাও, সম্ভবত সে বকা শুনতে আমার ভালোই লাগবে।'

আমি অপলক তাকিয়ে থাকি সুবর্ণর দিকে। আমি কী করে বোঝাই—ওর অদেখায় বুকের ভেতর জমতে থাকা কথার ফুলঝুরি এক নিমেষেই শূন্যে উধাও হয়ে যায় ওর কাছে গেলে। আমি কেবল মগ্ন হয়ে ওর কথাই শুনি। ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট খুনসুটি, মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে আমাকে রাগিয়ে দেওয়া—কী করে আমাকে এমন ভরিয়ে রাখতে পারে ও!

আমার চোখের সামনে ওর একটা হাত নাড়ায় সুবর্ণ, 'কী দেখছো এমন করে?'

আমি লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিই—আসলেই তো, কী দেখছি আমি? কী দেখছি সুবর্ণর মাঝে? শর্মী এখনো সুবর্ণকে দেখেনি। প্রায়ই ও আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'সুবর্ণ দেখতে কেমন রে?'

আমি কিছুই বলতে পারি না। ওর চোখ, নাক, মুখ, ওর উচ্চতা, ওর পোশাক কিছুই মনে পড়ে না আমার। আমি কি আর ওকে দেখি? দেখি ওর দৃষ্টির গভীরতা, দেখি ওর হৃদয়ের বিশালতা। এসব কি বলা যায় শর্মীকে!

পঞ্জিকা দেখে প্রতিটা বাংলা মাসে আমি একটা তারিখ দাগ দিয়ে রাখি। যে তারিখে রাতের আকাশে ফুটে থাকবে রূপালি পূর্ণিমার চাঁদ। আমার খুব ইচ্ছে এ রকম একটা রাতে রিকশা নিয়ে ঘুরে বেড়াবো পুরো শহর। তারপর

শহর ছাড়িয়ে চলে যাবো আরো দূরে। পাশে থাকবে আমার প্রিয় একজন।

সময়-সুযোগ সন্ধি করেনি কখনো। তাই আমার ইচ্ছেটাও পূরণ হয়নি। আজ সকাল থেকেই মনটা পাগল হয়ে আছে ইচ্ছাপূরণের আশায়। কিন্তু সুবর্ণকে বলি বলি করেও বলা হয়নি কথাটা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। চাঁদও উঠেছে। আমি ঝটপট তৈরি হয়ে নিই। মা আসার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। রাতের বেলা রিকশায় একা একা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

দরজার কাছে পৌঁছতেই মোবাইলটা বেজে উঠলো, সুবর্ণর ফোন। খুব খারাপ লাগছে ফোনটা ধরতে। ওকে বলা হবে না, আমার অপরাধবোধটাও বাড়বে।

শেষ পর্যন্ত ধরেই ফেলি ফোনটা। আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না ও, 'তূর্ণা, একটু বারান্দায় এসে দাঁড়াবে?'

'কেন?'

'আহা, দাঁড়াওই না, প্লি...জ।'

'আমি বারান্দায় দাঁড়াই।'

'আকাশের দিকে তাকাও, তূর্ণা। দেখো, কী সুন্দর পূর্ণিমা!'

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

'এবার একটু তোমাদের গেটের দিকে তাকাও তো।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'কেন?'

'তাকিয়ে দেখো একটা রিকশা, সেই রিকশায় সুবর্ণ নামের একটা ছেলে বসে আছে। তার খুব ইচ্ছে আজ রাতে সে রিকশায় সারা শহর ঘুরবে। তারপর শহর ছাড়িয়ে যাবে আরো অনেক দূরে। পাশে থাকবে তার ভালোবাসার মানুষ। আচ্ছা বলো তো, সেই মানুষটা কি ছেলেটার ডাকে সাড়া দেবে?'

আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। মনে হয় চোখ খুললেই দেখবো—সব স্বপ্ন, কোনো কিছুই সত্যি নয়।

আমার চোখ ভিজে ওঠে। একে কি ভালোবাসা বলে, নাকি মায়া?

ফ

ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও

সারাটা দিন খুব ব্যস্ততার মাঝে কাটলো আজ। ভার্সিটির সমস্ত কাজ আজ গুছিয়ে ফেললাম। বাকি দিনগুলো এখন শুধু আমাদের—আমার আর সুবর্ণর। দিনগুলো এখন শুধু ভালোবাসার, দিনগুলো কেবল ভালোবেসে অপেক্ষা করার।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিই। আর তখনই চোখ পড়ে দেয়ালে। আমার বন্ধু প্রজাপতিটা বসে আছে চুপচাপ। ক্লান্তিটুকু মুছে যায় এক নিমেষেই।

'কী খবর বন্ধু, হঠাৎ এই সময়ে?' উঠে গিয়ে আলতো করে ফুঁ দেই ওর গায়ে।

ডানাটা মৃদু নাড়ায় প্রজাপতিটা, 'কেন, আসতে নেই বুঝি?'

আমি বুঝতে পারি অভিমান হয়েছে ওর। তাই আমিও অভিমানী কণ্ঠে বলি, 'মন খারাপ না হলে তুই কখনো আসিস না তো।'

'মনটা খুব ভালো আজ, না?'

'হ্যাঁ বন্ধু, খুব ভালো।'

'আমি কিন্তু জানি কেন ভালো।'

'কেন বল তো।'

'আর কদিন পরেই তুমি বউ সাজবে তাই, ঠিক বলিনি?'

'তুই তো আমার বন্ধু, তুই সব জানিস। তবে কি জানিস, এই সুখের স্বপ্নটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।'

'স্বপ্ন কেন বলছো, এত সত্যি, আমার গায়ের সব কটি রঙের মতো সত্যি আর সুন্দর।'

'ঠিক বলেছিস, আমি একটু একটু করে তা-ই টের পাচ্ছি, আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছি।'

'তবে তো তুমি এখন খুব সুখী।'

'হ্যাঁ। আমার সুখগুলো কেবল ডানা মেলতে শিখেছে, এবার তোর মতো ওড়ার পালা।'

'কেমন?'

'এই যে আমি সাহসী হয়ে স্বপ্ন দেখি, সুবর্ণর সঙ্গে সারা দিন খুনসুটিতে মেতে থাকি, দুজন মিলে দেয়ালের রঙ ঠিক করি, পর্দার কাপড় কিনি, একেই কি ডানা মেলা বলে না? আর এতোগুলো স্বপ্ন নিয়ে যে দিনটার জন্য অপেক্ষা, সে কি আনন্দে উড়ার মতো নয়?'

'তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছো, বন্ধু।'

'হ্যাঁ, অনেক বড় হয়ে গেছি। মা বলে, আমার কাঁধে নাকি এখন এক পাহাড় দায়িত্ব। মা এ-ও বলে, সুখী হতে খুব বেশি কিছু লাগে না। ইচ্ছে থাকলে ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে খুব অল্পতেই সুখী হওয়া যায়।'

'তুমি তাহলে একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, না?'

আমি ভেজা ভেজা গলায় বলি, 'হ্যাঁ।'

'খারাপ লাগবে না আমার জন্য?'

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এতো সুখ-স্বপ্নের হাতছানি, এতো ভালোবাসা, ভালো লাগা, তবুও একটা নির্মম সত্যই বুকে এসে বাজে—সব ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে। অন্য ঘরে, অন্য আঙিনায়, এই প্রজাপতি, এই ঘর-দেয়াল-আসবাব, আমার ফেলে আসা দুরন্ত শৈশব-কৈশোর, স্মৃতিময় তারণ্য—কিছুই আমাকে ধরে রাখতে পারবে না এখানে। তবুও বারবার কেনে মনে পড়ে এসব? এ সবকিছু?

আমার একটা আঙুল ছুঁয়ে দিই প্রজাপতিটার গায়ে, 'বুকের মাঝে এতো যে সুখ, তারপরও কেন একটু চিনচিনে ব্যথা বলতে পারিস? বলতে পারিস স্বপ্নের পথে হাঁটতে হাঁটতে কেন বারবার স্মৃতির কাছে ফিরে যাওয়া?'

উড়ে যায় প্রজাপতিটা। আমি যেন শুনতে পাই ও উড়ে যেতে যেতে বলছে, 'জানি না, জানি না!'

ব

বড় বেদনার মতো বেজেছ তুমি, হে আমার অন্তরে

কথাটা বলতেই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসে শর্মী 'তার মানে আমি বাদ?'

আমি ওর নাকটা টেনে দিই, 'দূর বোকা, আমি তাই বলেছি নাকি?'

অভিমানে গাল ফোলায় শর্মী, 'তবে যে বললি তুই আর সুবর্ণ মিলে সমস্ত কেনাকাটা করবি?'

আমি দু হাত দিয়ে আমার দু কান ধরি, 'স্যরি, সমস্ত শব্দটা তুলে নিলাম। বিশেষ কিছু কেনাকাটা করব সুবর্ণর সঙ্গে, যেমন ধর, বিয়ের শাড়ি, কিছু গয়না।'

'ঠিক আছে, বিশেষ কিছু বিশেষ মানুষের সঙ্গে। তবে আমাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলবে না কিন্তু।'

আমি আলতো করে হাত ছোঁয়াই ওর গালে, 'তোকে ছাড়া আমার বিয়ের শপিং হবে নাকি?'

'হু।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে শর্মী। তারপর আবার শুয়ে পড়ে।

আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাতটা টেনে ধরি, 'মিস শারমিন সুলতানা শর্মী, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমি আপনাকে শপিংয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

চিৎকার করে ওঠে শর্মী, 'এখনই?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

খুব দ্রুত বিছানা থেকে নামে শর্মী, 'ঠিক পনের মিনিট, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

আমি বসে বসে শর্মীর ঘরটাতে চোখ বুলাই। সাদামাটা, কিন্তু গোছানো। যে জিনিসটা যেখানে থাকা দরকার, ঠিক সেখানেই আছে। দেয়ালে ঝোলানো ওর একটা ছবির দিকে চোখ পড়ে আমার। বছরখানেক আগের তোলা ছবি। উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। আনন্দের ছটা ঠিকরে পড়ছে ওর চোখমুখ থেকে। চিরকালই এমন শর্মী, উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে সজীব, আড্ডার মধ্যমণি আর ভীষণ গোছানো। নিজের জীবনটাও গুছিয়েছিলো যত্ন করে। তারপরও কেন যে এমন হলো! কেন

যে ওলট-পালট হয়ে গেলো সবকিছু!

ঠিক পনের মিনিটেই তৈরি হয়ে নেয় শর্মী। আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি আনেনি আজ শর্মী। রিকশা করে সারাটা দিন আমরা ঘুরে বেড়াই, এই মার্কেট থেকে সেই মার্কেটে। লিপস্টিক থেকে শুরু করে জুতো, সবকিছু কেনাতেই দুজনের অসম্ভব উচ্ছ্বাস!

ফেরার পথে শর্মী কিছুটা চুপ হয়ে যায়। আমার হাত ধরে বলে, 'তোর কেমন লাগছে রে?'

আমি ওর একটা হাত আমার বুকে টেনে নেই, 'এখানে খুব ব্যথা, মায়ের জন্য, আমার ঘরটার জন্য, তোদের জন্য।'

শর্মী কিছুটা ধমকের সুরে বলে, 'এসব ভাববি না একদম। সুখের সময় সুখের কথা ভাববি। দুঃখ-কষ্ট, স্মৃতি এগুলো কিছুই না। বেঁচে থাকাটাই সব, বেঁচে থাকাটাই আনন্দের।'

আমি জানি এটা ওর মনের কথা নয়। আমি জানি কেবল বেঁচে থাকাটাই সবকিছু নয়। ওর কণ্ঠটা ধরে আসে। আমার কাছে তা হাহাকারের মতো শোনায়—বেঁচে থাকাটাই সব, বেঁচে থাকাটাই আনন্দের!

আমি যদি ওর হাহাকারটা একটু ছুঁতে পারতাম!

ভ

ভালোবাসি ভালোবাসি...

অবশেষে সমস্ত লজ্জা নিয়ে আমি ড্রয়িং রুমের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল—যদি অলৌকিক কিছু একটা হতো, যদি ঝড় উঠতো, কিংবা অন্য কিছু। অথবা যদি আমি হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে পারতাম, তবে বেশ হতো। আমি চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না সুবর্ণর দিকে। ও কি কিছু বলবে আমাকে? খারাপ কিছু বলবে না ও, আমি জানি। কিন্তু সুন্দর কোনো কথা, কোনো প্রশংসাবাক্যও এ মুহূর্তে সহ্য হবে না আমার, একদম সহ্য হবে না।

সুবর্ণ ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আমার পায়ের তলায় মাটি আর একটু কাঁপলো যেন। অথচ কী আশ্চর্য, ও কেবল একটা বাক্যই বলল, 'চলো, এবার বেরোই।'

ওর গলা কাঁপলো না, চোখের পাতা নড়লো না। আমি এক মুহূর্তে যেন হাওয়ায় ভেসে গেলাম। আমার নীরবতা দেখে সুবর্ণ আবার বলল, 'বেরুবে না?'

রিকশায় উঠেই সুবর্ণ আলতো করে হাত রাখলো আমার পিঠে, যেন আমি বাচ্চা একটা মেয়ে, ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবো। এতো মজা লাগছিল আমার!

একটু যেন অন্যরকম লাগছে সুবর্নকে। ওকি একটু বেশি চুপচাপ? আমি ওর ধ্যান ভাঙাই, 'তোমার কি মন খারাপ, সুবর্ণ?'

'না, একদম না।'

'চুপচাপ কেন তাহলে?'

'ভাবছি।'

'কী ভাবছো এমন করে?'

'তোমার কথা। ভাবছি, তোমার নামের সঙ্গে তুমি একদমই মেলো না।'

'যেমন?'

'তূর্ণা মানে দ্রুতগামী। আর তুমি হচ্ছো ধীর, স্থির, মায়াবি। যেন একটা পাখির বাচ্চা। যাকে আদর করে রাখতে হয়, বুকের কাছে রাখতে হয়।'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই। এতো কিছু ভাবে ও? আমাকে নিয়ে?

শুধু আমাকে নিয়ে? আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকায় সুবর্ণ, 'শাড়িতে তোমাকে খুব ভালো লাগছে, তূর্ণা।'

অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে যায় বুকের ভেতরটা। আমি মাথা নিচু করে ফেলি।

সুবর্ণ ওর কণ্ঠে সহজাত উচ্ছলতা ফুটিয়ে তোলে, 'বিয়ের শাড়িটা কী রঙের কিনবে?'

একটু হাসি আমি। জানি, লাল রঙটা ওর খুব পছন্দ। সমস্ত স্বপ্নে, কল্পনায় ও আমাকে লাল রঙে সাজায়, লাল টুকটুকে বউ করে সাজায়।

ফেরার পথে চোখ দুটো ভিজে ওঠে আমার। বিয়ের আগে আজ ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আর একদিন পরই সারা জীবনের জন্য ওর হয়ে যাবো আমি। অথচ মনে হচ্ছে কতোদিন দেখবো না ওকে। কেন এমন হয়?

আমার হাতটা শক্ত করে ধরে সুবর্ণ, 'ভালোবাসা কাকে বলে জানো?'

'জানতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি অনেকবার, পারিনি।'

'তূর্ণা, তোমাদের কাজের বুয়ার একটা ছেলে আছে, অসুস্থ–সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, সারাক্ষণ মুখ দিয়ে লালা পড়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কখনো কি ভেবেছো, অভাবের সংসারে এই অসুস্থ ছেলেটাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছে তার মা?'

'না, ভাবিনি তো এভাবে!'

'ছেলেটাকে একদিন একদিন করে বাঁচিয়ে রাখার মাঝে, ছেলেটার আশ্রয় হওয়ার মাঝে যে সুখ, তার নামই ভালোবাসা। তোমার মা আজ যে একটা অবস্থানে আসতে পেরেছেন তা কেবল তুমি আছো বলে, তোমার আশ্রয় হতে পেরেছেন বলে। এর নামই ভালোবাসা, তূর্ণা।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে আমার চোখের দিকে স্থির হয়ে সুবর্ণ। তারপর খুব আদর করে আমার একটা হাত ধরে বলে, 'আমি তোমার পরিপূর্ণ আশ্রয় হতে চাই, তূর্ণা।'

ম

মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর

শরীর ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে। অথচ কী আশ্চর্য, চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। আমি উঠে বারান্দায় যাই। ব্যস্ত শহরটা ঝিম মেরে গেছে। নিস্তব্ধতার ধ্যান ভেঙে মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি শাঁই শাঁই ছুটে যায়। আশপাশের বাড়িগুলোর বাতি নিভে গেছে সব। কেবল আমি এক নিভৃত নিশাচর বুকের ভেতর একটা টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকি। কেউ জানে না, কেউ না।

এরকম কোনো কোনো রাতে পার্থ ফোন করে বলতো, 'রাত জেগো না, তূর্ণা। শরীর খারাপ করবে, তোমার টলটলে চোখে ক্লান্তি এসে ভর করবে। দেখে কষ্ট হবে আমার।'

কষ্ট! কষ্ট কি এখন হয় না ওর? আমার জন্য, আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য?

ধ্যাৎ, আজ আবার পার্থর কথা মনে হলো কেন হঠাৎ! এতদিন তো একদমই মনে পড়েনি, একবারের জন্যও না। এ কি সুবর্ণর ভালোবাসার শক্তি, নাকি আমার মনের জোর——আমি একবারও মনে করতে চাইনি বলে! কে জানে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব। সুবর্ণ কিংবা শর্মী। প্রজাপতিটাও আসেনি আজ। ওর কি অভিমান হয়েছে আমার ওপর?

জানালার পাশে এসে দাঁড়াই। মানিপ্লান্ট গাছটার কয়েকটা পাতা হলুদ হয়ে উঠেছে। যত্ন নেওয়া হয় না কয়েকদিন, হয়তো তাই। আমি ওর একটা পাতা ছুঁয়ে দিই, 'কেমন আছিস রে তুই'

হালকা বাতাসে মৃদু মৃদু দোল খায় গাছটা। একা একা কথা বলতেই ভালো লাগে আমার, 'সবকিছু কেমন যেন রঙিন হয়ে উঠেছে, তাই না?'

গাছটা দোল খায় আবার। আমি আবার ওকে ছুঁয়ে দিই, 'কি, রাগ হয়েছে আমার ওপর? হওয়ারই তো কথা। কি করবো বল, একদম সময় পাই না যে।'

বারান্দার গ্রিলটা ধরে দাঁড়াই এবার। রাতের আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে আছে। রাত জেগে তারা চেনার অদ্ভুত নেশা ছিলো একসময় আমার। আর এখন! কী অনায়াসে কেটে যায় প্রতিটা প্রহর! সারা দিন সুবর্ণর সান্নিধ্য, সুবর্ণর সৌরভ নিয়ে ঘরে ফেরা, ওকে নিয়ে স্বপ্ন বোনা। মনে হয়, এখানেই থেমে যাক জীবনটা, এই সুখ টুকু নিয়ে মরে যাই চুপচাপ——পড়ে থাক সপ্তর্ষী, লুব্ধক কিংবা শুকতারা!

য

যদি তোমার দেখা নাই পাই

ঘুমের মাঝেই টের পেলাম আমার কপালে একটা নরম ঠাণ্ডা হাত। মনটা নেচে উঠলো আমার। মা এসেছে, আজ অনেক অ-নে-ক দিন পর মা এসেছে আমার ঘুম ভাঙাতে। আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি আমি। এটা আমার একধরনের খেলা। আমি জানি, যতোক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকবো, ততোক্ষণ মা আমার কপালে, মাথায় হাত বুলাবে।

'ওঠ মা, লক্ষ্মী মা আমার, ওঠ।' মা আমার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বলে।

আমি পাশ ফিরে শুই।

'ওঠ মা, আমার অনেক কাজ আছে। ওঠ, না হয় আমি কিন্তু এখনই চলে যাবো।'

আমি লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসি।

মা হাসে 'এতোক্ষণ মিছেমিছি শুয়েছিলি, তাই না?'

আমি মাথাটা উচুঁ-নিচু করি।

'কেন এমন করিস বল তো, মা?' মা আহ্লাদী কণ্ঠে বলে।

'ভালো লাগে মা, খুব ভালো লাগে। তুমি যতোক্ষণ আমাকে ছুঁয়ে থাকো অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে যায় মন। কী যেন একটা আছে তোমার ছোয়ায়।'

'কী?'

'কে জানে, ঠিক বুঝি না, কখনো মনে হয় সাহস, কখনো মনে হয় নির্ভরতা।'

মা হাসতে হাসতে একটা হাত ছোঁয়ায় আমার গালে, 'পাগল মেয়ে আমার'।

আমি মায়ের কাঁধে মাথা রাখি, 'একটা কথা বলি, মা?'

'একটা কেন একশটা বল।'

'তোমার কি মনে আছে, ছোটবেলায় আমি খুব টিভি দেখতাম?'

'হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে। বেশি টিভি দেখার জন্য মাঝে মাঝে আমি

তোকে বকাও দিতাম।'

'আমি কী করতাম জানো? মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বেশি টিভি দেখতাম, তোমার বকা শুনবো বলে। তোমাকে রাগাতে এত ভালো লাগতো আমার! তুমি যখন শাসন করতে মনে হতো—এই তো আছে, আমার একজন মা আছে। তুমি রাগতে, আমি চুপিচুপি হাসতাম।'

'আমার রক্তমাংসে গড়া ভ্রূণ তুই, আমার সমস্ত আকাঙ্খা নিয়ে জন্মালি। আমার চোখের সামনে একটু একটু করে বড় হলি। তুই যে এতো দুষ্ট কখনো তো বুঝিনি রে!'

'তুমি ছোটবেলা থেকে আমাকে খুব স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছ। নিজে নিজে খেতে শিখিয়েছো, নিজে নিজে পড়তে। প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু আহ্লাদ করনি আমাকে। তাই হয়তো তোমার ভালোবাসা, তোমার শাসন, কখনো পুরনো হয় না আমার কাছে। তুমি কি আজ আমাকে মুখে তুলে খাইয়ে দেবে, মা?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে মা। আমি টের পাই মা কাঁদছে। কাঁদছি আমিও। আমাদের সমস্ত ভার, সবটুকু বেদনা কান্নার জল হয়ে হারিয়ে যাক। আমরা নতুন করে আর একটা সকাল শুরু করি—আনন্দের সকাল, ভালোবাসার সকাল।

অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয় মা। বেশ স্বাভাবিক গলায় বলে, 'শর্মী আসবে না।'

'তুমি যে কী বলো মা, শর্মী আসবে না, এটা কি হয়? দেখবে একটু পরেই চলে আসবে শর্মী, এসেই হৈচৈ শুরু করে দেবে।'

মা একটু হাসে, 'তুই উঠে ফ্রেশ হয়ে নে। অনেক লোকজন আসবে আজ। আত্মীয়স্বজন, অফিসের লোকজন, তোর আরো বন্ধুবান্ধব। নিজেকে একদম গুটিয়ে রাখবি না কিন্তু, সবার সঙ্গে মন খুলে মিশবি। পারবি না, মা?'

আমি মায়ের একটা হাত ধরি, 'পারতে আমাকে হবেই, মা।' ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও মা দাঁড়ায়, 'ড্রয়িংরুমে একগোছা ফুল এসেছে।'

আমি অবাক হই, 'কে পাঠিয়েছে মা?'

মা হাসে, 'কে আবার, সুবর্ণ।'

আমি লজ্জায় লাল হয়ে যাই। মা বেরিয়ে যেতেই দৌড়ে ড্রয়িংরুমে যাই—পুরো রুমটা আলো করে আছে একগোছা দোলনচাঁপা। সঙ্গে একটা কার্ড। কার্ডটা খুলতেই দেখি সুবর্ণের হাতে লিখা একটা মাত্র বাক্য—'প্রতি মুহূর্তে একবার করে মরি, তোমার বিহনে।'

র

রাতের তারা চাঁদ জেগে রয়, আমি জেগে রই বলে

বুকের ভেতর থেকে একটা শিরশিরে অনুভূতি কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে যেন। আমি কিছুতেই স্থির বসে থাকতে পারছি না। হাতের তালু ঘামছে, হাঁটু কাঁপছে।

ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে বাড়িতে। এই বাড়িতে এতো লোকজন এর আগে আমি আর দেখিনি কখনো।

কাজটা যতোটা সহজ হবে ভেবেছিলাম, ততোটা সহজ নয়—সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা, বসতে বলা, সবার খোঁজখবর নেওয়া। আমি তো একেবারে হিমশিম খাচ্ছিলাম। মা-ও বুঝতে পারছিলো আমার কষ্টটা।

শর্মী আসাতে আমি বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম। সবাইকে আপ্যায়ন করা, মজার মজার কথা বলা, বন্ধুদের আসার জন্য ফোন করে তাগাদা দেওয়া—সবকিছু একাই সামলাচ্ছিলো ও। কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে যায় আমার।

সেই সাতসকালেই মা জোর করে তার একটা শাড়ি পরিয়ে দেয় আমাকে, জলপাই সবুজ শাড়িতে সোনালি পাড়। মার খুব প্রিয় একটা শাড়ি, আমারও। স্বর্ণ আমার কোনোদিনই পছন্দ না, মা জানে, তবুও শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে হালকা কয়েকটা গয়না পরিয়ে দেয়। টিপ দেয় কপালে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বলে, 'দেখ তো কেমন লাগছে?'

'নিজেকে কেমন পুতুল পুতুল লাগছে, মা।'

আমার কপালে চুমু খায় মা, 'সবাই আসবে, আর অবাক হয়ে আমার পুতুল পুতুল মেয়েটাকে দেখবে। দেখবে, সেই ছোট তূর্ণা কতো বড় হয়ে গেছে, সেই তূর্ণার আজ গায়ে হলুদ।'

সেই তখন থেকেই পুতুল সেজে সারা বাড়ি ঘুরছি। মাকে দেখতে ইচ্ছে হলে সারা বাড়ি খুঁজে মাকে বের করি। রান্নাঘরে যাই। বুয়া আমাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে, 'ও আল্লা, আফ্‌নে এই হানে কেন? আমারে ডাকলেই তো আমি যাইতাম'।

'কিছু হবে না, বুয়া। তুমি কাল তোমার ছেলেটাকে নিয়ে এসো, কেমন?'

খুব খুশি হয় বুয়া। ওর চোখ দেখে বুঝি আমি। 'বুয়া, খুব পচা লাগছে আমাকে?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটে বুয়া, 'কী যে কন! আফনারে রাজকইন্যা রাজকইন্যা লাগতাছে।'

আমি হাসি, 'রাজকন্যা দেখেছো তুমি?'

'দেখি নাই, তয় আমি জানি—আফনে তাগো মতোই সুন্দর।' লজ্জা পেয়ে বলে বুয়া।

রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আমি আবার সারা ঘর বেড়াই। শর্মী এসে খুনসুটি করে, 'অ্যাই, তোর না আজ গায়ে হলুদ! তুই এমন বেহায়ার মতো ঘুরছিস কেন?'

আমি একটা ভেংচি কেটে সরে আসি। আসতে আসতে মানুষগুলো দেখি। এতো মানুষ! এতো সম্পর্ক! আচ্ছা, মানুষ যখন দূরে যায়, হারিয়ে যায়—সম্পর্কগুলোর কী হয় তখন? মানুষ হারায়, সম্পর্ক কি হারায় কখনো? নাকি কালের ধুলো একসময় ঢেকে দেয় সম্পর্কগুলো? জানি না, আমি সত্যিই জানি না।

আমার রুমে পৌঁছানোর সাথে সাথে মোবাইলটা বেজে উঠলো—সুবর্ণর ফোন। ও বলেছিলো সন্ধ্যার পর ফোন করবে। কথা রেখেছে। ও সবসময়ই কথা রাখে। হৈচৈ থেকে বাঁচার জন্য আমি মোবাইলটা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই, ও বলে, 'কী করছো?'

আমি উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দেরি করি না, 'আমার প্রিয় মানুষটির সাথে কথা বলছি, আর রাতের আকাশ দেখছি।'

'আর কী দেখছো?'

'দেখছি রাতের আকাশ লক্ষ-কোটি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়েছে আমার জন্য, আমাদের জন্য।'

ল

লুকিয়ে আছো গভীর বুকে

মায়ের দিকে তাকিয়ে জীবনে এই প্রথম কেমন যেন অন্যরকম লাগে আমার। আমার চিরচেনা সহজাত মাকে আমি খুঁজে পাই না তার মাঝে। যে মা দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামলায় সবকিছু, যার উপস্থিতি একটা অসীম দুর্যোগে সাহসের ভূমিকা রাখে, সেই মা আজ কেমন যেন নিষ্প্রভ, এলোমেলো।

এতো মানুষের ভিড়ে মাকে আমার একা পেতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু যতোবারই তার কাছে যেতে চেয়েছি ততোবারই কেউ না কেউ এসে উপস্থিত। শেষমেশ শর্মীর কাছে কথাটা বলি, 'তুই কি আমার একটা কাজ করে দিবি, শর্মী?'

হালকা একটা ধমক দেয় ও আমাকে, 'কী এতো মিনতি করে কথা বলছিস! সরাসরি বল কী করতে হবে, আমি এখনই করে দিচ্ছি।'

আমি ওর হাত ধরি, 'তুই কি একটু দেখবি মায়ের কী হয়েছে?'

শর্মী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'কেন, খালাম্মার কি কোনো অসুখ করেছে নাকি?'

'আমি যতোদূর জানি, মায়ের তেমন কোনো বড় অসুখ নেই। কিন্তু বুঝতে পারছি না, মাকে কেন যেন অন্যরকম লাগছে আজ।'

'তুই একদম চিন্তা করবি না, চুপচাপ বসে থাক। আমি খোঁজ নিয়ে এখনই আসছি।' বলেই হাওয়া হয়ে যায় শর্মী।

আমাকে ঘিরে বসে থাকা একদল মানুষ। আমি তাদের মাঝে একা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকি বেশ কিছুক্ষণ। শর্মী ফিরে এসেই হাসতে থাকে, 'তুই শুধু শুধুই চিন্তা করছিস, কিছু হয়নি খালাম্মার। তোর বিয়ে তো, তাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছেন আজ। হাজার হোক, একটা মাত্র মেয়ে তো।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'তুই ঠিক বলছিস তো?'

ও আমাকে ছোঁয়, 'এই আমি তোকে ছুঁয়ে বললাম। আমার ওপর তুই বিশ্বাস রাখতে পারিস।'

বুকের ওপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে যায় মুহূর্তে। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে আমি শর্মীর দিকে তাকাই। আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও লেগে

পড়ে নিজের কাজে। খুব কৌশলে আমার রুমটা ভিড়মুক্ত করে। তারপর জড়ো করে অন্য বান্ধবীদের। চিৎকার করে বলে, 'শোন্, আজ আমার এই প্রিয় বান্ধবীটাকে সাজাবো, হলুদ পরী করে সাজাবো।'

সবাই একসাথে চিৎকার করে জানায়—ওরা রাজি।

শর্মী লেগে পড়ে আমাকে নিয়ে। সবাই মজার মজার কথা বলে, হাসে, শর্মী গম্ভীর মুখে সাজায় আমাকে। বাসন্তি রঙের কটকি কাতানে জড়ায়, খোঁপা করে, বেলীর গয়না পরায়। মাঝে মাঝে ধমকও দেয়, 'অ্যাই, নড়বি না একদম। আর খবরদার, চোখে পানি আনবি না, আনলে আমি তোকে খুন করে ফেলবো।' আমি একটু আয়না দেখতে চাইলে ধমকায় আবার, 'না, একদম সবকিছুর শেষে।'

বাধ্য মেয়ের মতো চুপচাপ বসে থাকি আমি। সব শেষ করে ও যখন আমাকে আয়নার সামনে দাঁড় করায়, আমি অবাক! আয়নার মানুষটা কি আমি ! আমি কি এত সুন্দর!

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো, কে যেন দরজায় টোকা দিয়ে বলে যায় সুবর্ণদের বাড়ি থেকে মেহমানরা এসেছে। বন্ধুরা ঘিরে ধরে আমাকে। আমাকে ধরে ধরে এগিয়ে নিয়ে যায়—যেন আমি নতুন হাঁটতে শিখেছি, ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে।

আজকের সমস্ত আয়োজন ছাদে। সেদিকে এগোতে এগোতে আমার দু চোখ মাকে খোঁজে। হৈচৈয়ের মাঝে কান পাতি মায়ের কণ্ঠটা শোনার জন্য। পাই না, কোথাও পাই না। বুকের ভেতর থেকে হাহাকার উঠে এসে গলার কাছে জমাট বেঁধে থাকে।

এই জমাট হাহাকারটা কান্না হয়ে বোরোয় স্টেজে, মা যখন আমাকে রাখী পরাতে আসে। কোথায় লুকিয়ে ছিলো এতো কান্না, কোথায়! কোত্থেকে উঠে আসে একসমুদ্র কান্নার ঢেউ!

শ

শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে

আজ এমন হওয়ার কথা ছিলো না।

গায়ে হলুদ, মেহেদি, খাওয়া-দাওয়া—সব শেষ হতে প্রায় ভোর রাত। বাকি সময়টা সবাই মিলে চুটিয়ে আড্ডা। আজ আমার ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ার কথা, ঘুমের টানে এলোমেলো হওয়ার কথা। আজ আমার ভেজা পালকের মতো ম্লান হওয়ার কথা। অথচ না, এসবের কোনোটাই হয়নি আজ। আজ আমি শিশির ভেজা সজীব, আজ আমি ভালোবাসার রঙে রঙিন।

ওরা আমাকে আয়নার সামনে বসিয়ে রেখেছে। আমি বারবার হাত ছোঁয়াই আমার গালে। তবু বিশ্বাস হয় না—এ কি আমি!

সুবর্ণর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব। ওকে বলতে ইচ্ছে করছে—দেখো, আমি তোমার মনের মতো করে সেজেছি। আমি তোমার লাল টুকটুকে বউ হয়ে সেজেছি।

আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সুবর্ণ, অনিবার্য পতন থেকে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত অনন্ত স্থবিরতা থেকে। স্বপ্নগুলো মুঠোবন্দি করে আমি এখন অহংকারী একজন। কোনো কিছুই এখন আর অসম্ভব মনে হয় না আমার। অবশেষে আমি নিজ হাতে ভাঙতে পেরেছি আমাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিষাদের দুর্গ।

সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। শর্মী বলে, 'বিয়ের দিন বৃষ্টি হলে সংসার সুখের হয়।'

হ্যাঁ, এখন তো আমার সুখের ডানায় ভর করে উড়বার কথা, সুবর্ণকে নিয়ে। আমার আকাঙ্ক্ষার উঠোনে ভালোবাসার জলচৌকি পেতে রেখেছি—ও আসবে বলে, আমার হাত ধরবে বলে। কবিতার কাছে প্রহরগুলো বন্ধক রেখে আমরা হারিয়ে যাবো অন্য ভুবনে। আমরা হাত ধরে রোদে হাঁটবো, ক্লান্ত হবো না। আমরা প্লাবনে গা ভাসাবো, তবু হারিয়ে যাবো না। ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা দিয়ে আমরা খুলে ফেলবো সুখের এক লক্ষ দরোজা।

হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাসে জানালার পর্দাটা ওড়ে। এক পশলা ভেজা বাতাস আমার গায়ে এসে লাগে। আমি আমূল কেঁপে উঠি একবার আর মনে মনে বলি, 'তুমি কি আমায় ছুঁয়ে গেলে, সুবর্ণ?'

স

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়

বাঁ চোখের পাতাটা কেঁপে ওঠে তিরতির করে। স্বপ্ন সাঁতরে আমি উঠে আসি বাস্তবের চিলেকোঠায়—যেখানে কেবল হৈচৈ আর মানুষের হুড়োহুড়ি। যেখানে কেবল শব্দের ভিড়ে সবকিছু একাকার।

খুব পিপাসা পেয়েছে আমার। এদিক-ওদিক তাকাই। এতো মানুষ, তবু কথাটা বলার জন্য কাউকে খুঁজে পাই না। হাসি পায় আমার। এই ঘরটার সবচেয়ে আপন মানুষ আমি। আমিই বোধহয় সবচেয়ে ভালো জানি—এসবের কোথায় কী আছে। অথচ কী আশ্চর্য, আমি আজ কেবলই নীরব দর্শক!

কোথা থেকে যেন হুড়মুড় করে শর্মী ঢোকে ঘরে। এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে পানির গ্লাস। আমার পাশে বসতে বসতে বলে, 'সারা দিন কিছু খাসনি, নে তোকে খাইয়ে দিচ্ছি।'

আমি কিছুটা চিৎকার করে উঠি, 'পাগল হয়েছিস! এ অবস্থায় খাওয়া যায়!'

'এ সময়ে এভাবেই খেতে হয়।'

খেতে খেতে কেমন যেন আমার চোখে জল এসে যায়। আমি শর্মীর একটা হাত ছুঁয়ে বলি, 'আমার খুব মজা হয়েছে রে—কাল সকালে মা খাইয়ে দিলো, রাতে তোরা সবাই, এখন আবার তুই।'

শর্মী চোখ দুটো বিশেষ ভঙ্গিমা করে বলে, 'আগামীকাল থেকে সুবর্ণ।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শর্মী হঠাৎ আমার থুতনিটা উঁচু করে ধরে বলে, 'তূর্ণা, এই যে বউ সেজে আছিস, কারো জন্য অপেক্ষা করে আছিস, কেমন লাগছে এখন তোর?'

'ভয়, কষ্ট, আনন্দ—সবকিছু মিলিয়ে এক অন্যরকম অনুভূতি, আমি তোকে বোঝাতে পারবো না রে।'

শর্মী ওর বাঁ হাতটা আমার কাঁধে রাখে। তারপর ছলছল চোখে বলে, 'এ রকম অনুভূতি কয়জনের হয় বল, কতোজন তোর মতো লাল পরি সেজে এভাবে বসে থাকতে পারে কারো জন্য?'

কথাটা শুনে বুকের ভেতর কেমন যেন করে ওঠে আমার। আমি শর্মীর

চোখের দিকে তাকাই—ওর চোখ ছলছল করছে। চোখ ফেটে জল আসতে চায় আমারও। শর্মীর মাথা আমার কাঁধে ঠেকিয়ে আমি চুপচাপ বসে থাকি অনেকক্ষণ।

হঠাৎ ড্রইংরুম থেকে কেমন যেন হৈচৈ শোনা যায়। কেউ একজন চিৎকার ওঠে—আল্লা রে! কেউ একজন বলে—অ্যাকসিডেন্টটা কীভাবে হলো!

শর্মী আর আমি রুম থেকে বের হয়ে আসি। অনেক মানুষের ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। কেউ কেউ দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে, আমার পিঠে হাত রাখে, কেমন শান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। আমি কিছুই বুঝি না। কেবল তাকিয়ে দেখি—পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মা, চুপচাপ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মা সামনের দিকে, মায়ের চোখে জল নেই, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জল যেন জমাট বেঁধে আছে তার চোখের ভেতর।

পাশের কোনো গাছ থেকে হঠাৎ একটা কাক ডেকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ওঠে আরো অনেকগুলো কাক।

আশ্চর্য, সামনের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখন। কেবল চোখে পড়ছে—সবুজ ঘাস, আর তার ছোট ছোট নীল ফুল। ঘাসগুলো কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে, ফুলগুলো ঝরে গেছে অবহেলায়। আর চোখে ভেসে উঠছে কেবল নিজের মুখটা—যে মুখে কোনো হাসি নেই, কেবল কান্না আর কান্নার ফোঁটা ফোঁটা জল—প্রতিটি ফোঁটার সঙ্গে ঝরে পড়ছে সুখ, আনন্দ আর বেঁচে থাকার উচ্ছ্বাস!

হ

হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছো—শূন্য পূর্ণ করে

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠতেই মনে হলো—আজ আমি সাজবো। যতোটুকু সাজলে আর সাজা যায় না, ঠিক ততোটুকু সাজবো, খুব চমৎকারভাবে সাজবো। কারণ, আজ অন্যরকম একটা দিন।

আজ আমি সাজবো।

খুব যত্নে ভাঁজ করে রাখা শাড়িটা আমি বের করে আনলাম আমার ওয়াল কেবিনেট থেকে, আর সমস্ত গয়না নিয়ে রেখে দিলাম আমার বিছানার ওপর। শাড়ির ভাঁজ খুলে প্রথমে আমি শাড়ির ঘ্রাণ নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে পরতে লাগলাম শাড়িটা। বেশ সময় নিয়ে শাড়িটা পরে আয়নার সামনে আমি বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। আয়নার ওপাশে নিজের চোখ দুটো দেখে নিজেরই কেমন যেন মায়া হলো আমার। সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে খুব যত্ন করে সে চোখ দুটো সাজালাম আমি। তারপর কপালে পরলাম একটা লাল টকটকে টিপ। মুগ্ধ চোখে আরো কিছুক্ষণ নিজেকে দেখে সবশেষে উঠে দাঁড়ালাম আমি এবং ঘড়ির দিকে তাকালাম—ছয়টা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট, ঠিক সাতটার সময় সুবর্ণ আসবে বর সেজে। আজ আমার বিয়ে। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ আজ ঠাঁই নিয়েছে আমার বুকে, বুকের ভেতরে।

আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি—ছয়টা বেজে পয়তাল্লিশ, আর মাত্র পনের মিনিট।

হঠাৎ দরজা খুলে মা ঢোকে আমার ঘরে। বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে নেয় আমাকে। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে মাকে থামিয়ে দেই। তারপর মায়ের চোখের দিকে সরাসরি তাকাই—আমি জানি, সুবর্ণ আর কোনোদিন বর সাজবে না, ও আর কোনোদিন আমার কাছে আসবে না, পৃথিবীর ওপার থেকে ও আসতে পারবে না, নিয়তি ওকে আসতে দেবে না। তারপরও প্রতি বছর এ দিনটা এলেই আমি সাজি, সাজবো। একা একা সাজবো, খুব অদ্ভুতভাবে সাজবো।

আমি কেবল জানি না—আমার বাবা কে। আমি আমার মায়ের গর্ভে

এসেছিলাম কোনো আয়োজন ছাড়াই। অনাকাঙ্ক্ষিত এই আমি পৃথিবীতে আসার আগেই অবিবাহিত মাকে ছেড়ে গেছে তাকে যে ভালোবেসেছিল, ভালোবেসে তার গর্ভে আমাকে যে স্থাপন করেছিল। তারপর মাকে ছেড়ে গেছে তার কাছের সবাই। এসব জেনে অভিজাত ভালোবেসেও পার্থ ছেড়ে গেছে আমাকে, ওর বাপ-মা চায়নি এ রকম পিতৃপরিচয়হীন মেয়েকে ঘরের বউ করতে।

আমার মা সেই কবে থেকে একা, আমাকে নিয়েও একা। একা একাই তার পথচলা, সংগ্রাম করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। আমি এও জানি—এ সব কিছুই আমার জন্য।

চোখ ফেটে জল আসছে আমার, আমি কি কাঁদছি! না, আমি আর কাঁদবো না। বছরের প্রতিটা দিনই কাঁদি, আজ কাঁদবো না। মা আমার দিকে আরো একটু এগিয়ে আসে। আমাকে ছুঁতে চায় মা। আমি আবারও হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দেই তাকে। তারপর বলি, 'জানো মা, সবকিছু জেনেও প্রতি বছর এ দিনটায় সাজতে ইচ্ছে করে আমার। আর সাজতে বসলেই গতজীবনে ঘটে যাওয়া প্রায় সব কথা মনে পড়ে যায় আমার। মনে পড়ে যায় পার্থর কথা, সুবর্ণর কথা, শর্মীর কথা, তোমার কথা। মা, বছরের প্রতিটি দিনই তো অন্যের মুখ চেয়ে হাসি, অন্যের মুখ চেয়ে কাঁদি, অন্যদের জন্য বাঁচি। একটা দিন না হয় থাকলো কেবল আমার, নিতান্তই আমার।

সুবর্ণ আর কখনোই আসবে না—আমি জানি। জানি না কখন, কিন্তু আমার মন বলে ও ঠিকই একদিন এ দিনটিতে আসবে এবং এসেই খুব অবাক হয়ে দেখবে—আমি বউ সেজে বসে আছি, আমি বসে আছি কেবল ওর জন্য। পৃথিবীর সবগুলো কুঁড়ি আজ ফুটবে বলে।'

বারান্দায় আসি আমি। অপার্থিব সাজে অপরূপভাবে সেজেছে প্রকৃতি, রূপালি আলোয় সবকিছু কেমন ঝলমল করছে। সমস্ত পৃথিবী আজ ভেসে যাচ্ছে উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায়। হায়! সেই ভেসে যাওয়া জ্যোৎস্নায় আমি নেই, আমার ঠাঁই নেই, এমনকি আমার ছায়াও নেই!